বঙ্গ
কমলবার্তা

নভেম্বর সংখ্যা। ২০২৪

বিজেপি

মহারাষ্ট্রে গেরুয়া ঝড়

ট্রাম্পের জয়ে আতঙ্কে ইউনূস

ওয়াকফ না মগের মুলুক?

এবার কি পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হওয়ার পথে?

রেল 'জিহাদ'!

মানসিকতাঃ বাংলাদেশের উভয় সঙ্কটের কারন

আমেরিকায় জাতীয়তাবাদী ঝড়

সংবিধানে কি অবহেলিত ভারতের জাতীয় সত্তা?

ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো-তে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন এবং বিশ্বের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নাইজেরিয়ায় 'গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য নাইজার' পুরস্কারে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

গায়ানার সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার 'দ্য অর্ডার অফ এক্সিলেন্স'-এ ভূষিত নরেন্দ্র মোদী। ৫৬ বছর পর (ইন্দিরা গান্ধীর পর) গায়ানা সফরে এই প্রথম গেলেন কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধান।

বঙ্গ
কমলবার্তা
নভেম্বর সংখ্যা। ২০২৪

মহারাষ্ট্র জয় জাতীয়তাবাদীদের:
অপেক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ ৪
সৌভিক দত্ত

ওয়াকফ না মগের মুলুক? ৭
বিনয়ভূষণ দাশ

পশ্চিমবঙ্গ কি এবার বাংলাদেশ হওয়ার পথে? ১০
অগ্নিকিশোর দত্ত

রেল 'জিহাদ'! ১২
অভিরূপ ঘোষ

আমেরিকায় জাতীয়তাবাদী ঝড় ১৪
জয়ন্ত গুহ

ছবিতে খবর ১৬

ট্রাম্পের বিপুল জয়ে আতঙ্কে ইউনূস ২২
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

মানসিকতাঃ বাংলাদেশের উভয় সঙ্কটের কারণ ২৫
নারায়ণ চক্রবর্তী

সংবিধানে কি অবহেলিত ভারতের ২৯
জাতীয় সত্তা?
সজল কুমার বিশ্বাস

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

বিধানসভা নির্বাচনে হরিয়ানার পর মহারাষ্ট্র বিজেপির। হরিয়ানায় যদি গেরুয়া ঝড় হয় তাহলে মহারাষ্ট্রে গেরুয়া সুনামি। উদ্ধবের স্বল্প-সংখ্যক তোষণ গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তায়। সংবিধান নিয়ে 'নকল গান্ধী' রাহুলের বস্তাপচা লেকচারের পচা গন্ধে বিরক্ত মানুষ। কোনও ইস্যু না পেয়ে শেষমেশ আবার শুরু করেছিল আদানি আদানি আদানি। পাত্তাও দেয়নি ভোটাররা। স্বাভাবিক। বাকী রইল শারদ পাওয়ার। এতটাই 'লো-পাওয়ার' যে তাতে ১০ ওয়াটের বাল্বও জ্বলবে কিনা সন্দেহ। সম্ভবত তিনটি কারণে মহারাষ্ট্রে ইন্ডি জোট ভেসে গেছে প্রবল সুনামির ধাক্কায়। প্রথমত বিজেপি সহ এনডিএ জোট পৌঁছে গেছে প্রতিটি গলির প্রতিটি বাড়িতে। এই যোগাযোগ সংযোগ তৈরি করেছে ভোটের বাক্সে। দ্বিতীয়ত যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব। দেশের বানিজ্যিক রাজধানীর জন্য তো বটেই, পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনও আপনাআপনি বদলে যায় শুধুমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। তৃতীয়ত বালাসাহেব ঠাকরের ভোটাররা বালাসাহেবকে কখনও কংগ্রেসের সামনে নত হতে দেখেনি, চোখে চোখ রেখে কথা বলতে দেখেছে। মহারাষ্ট্র কখনও ভুলবে না তাঁদের প্রিয় নেতা বালাসাহেব কতখানি স্নেহ করতেন নরেন্দ্র মোদীকে।

মহারাষ্ট্রের এই গেরুয়া সুনামি শুধু মহারাষ্ট্রেই থেমে থাকবে না। তৈরি করে দেবে জাতীয় রাজনীতির রূপরেখা। হরিয়ানার পর মহারাষ্ট্রে এই মহা জয়ের পর দ্বিধাহীন এবং অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগোবে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সংস্কারের চাকা। সংসদে ওয়াকফ বিল এবং ইউসিসি বা সেকুলার সিভিল কোড (নরেন্দ্র মোদীর নতুন ব্র্যান্ডিং) পাস করাতে কোনও নরম অবস্থানে যাবেনা সরকার।

জাতপাত নিয়ে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নোংরা খেলার জবাব দিতে মহারাষ্ট্রে হিন্দু ভোট সংগঠিত করতে 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়' এবং 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' স্লোগান ম্যাজিকের মত কাজে দিয়েছে। সঙ্গে ছিল ৬৫টি সংগঠনকে নিয়ে সংঘের 'সজাগ রহ' অভিযান। যা রুখে দিয়েছে জাতপাতের ভিত্তিতে হিন্দু ভোটের বিভাজন। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের পর ২০২৪ মহারাষ্ট্র বিধানসভা ছিল বিজেপির এক্সপেরিমেন্ট। ১০০ ভাগ সফল এক্সপেরিমেন্ট। তৈরি হিন্দুত্ব ২.০-র সময়োপযোগী দলিল। জাতীয় স্তরে প্রয়োগের জোরালো সম্ভাবনা।

সোজাকথা আমেরিকায় ডেমোক্র্যাট (বামপন্থী)-দের 'গৌরী সেন' এবং মোদী-ভারত বিরোধী কুখ্যাত জর্জ সোরোসের ভারতীয় এজেন্ট কংগ্রেস এবং 'নকল গান্ধী' রাহুলের বিষ দাঁত (জাতপাতের বিষ) ভেঙ্গে দিয়েছে মহারাষ্ট্রের এক্সপেরিমেন্ট। মহারাষ্ট্র-উত্তরপ্রদেশে (উপনির্বাচন) বিজেপি তার নীতিকে জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করায় ইন্ডি জোটে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকাবে এবার জোটসঙ্গীরাই। রাজ্যসভায় বড় বিপদের মুখে পড়তে পারে বিরোধীরা। হাতছাড়া হতে পারে দিল্লি বিধানসভাও।

মহারাষ্ট্র জয় জাতীয়তাবাদীদের অপেক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ

সৌভিক দত্ত

মহারাষ্ট্রের এই জয় শুধু মহারাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। জাতপাতের বিষাক্ত রাজনীতিতে হিন্দু ভোট বিভাজনের যে খেলা খেলেছিল কংগ্রেস ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে, সঙ্ঘ-বিজেপির যৌথ প্রচেষ্টায় মহারাষ্ট্রে তৈরি হল তার অ্যান্টিভেনম। এক্সপেরিমেন্ট সফল। এবার এই ওষুধ জাতীয় স্তরে প্রয়োগের অপেক্ষায়।

হরিয়ানা নির্বাচনের পরে আবারও একবার সারা ভারত জুড়ে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করল জাতীয়তাবাদী শিবির। লোকসভা নির্বাচনে সাময়িক ধাক্কা খাওয়ার পরে যে জাতীয়তাবাদী শিবিরের সার্বিক পতন দেখার অপেক্ষায় ছিল দেশবিরোধী শক্তিরা, তাদের হতাশ করে বিধানসভা এবং উপনির্বাচনগুলিতে আবারও অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উপস্থিত হলো বিজেপি এবং তার জোট সঙ্গীরা। বিশেষত মহারাষ্ট্রে যেভাবে তারা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে ও কংগ্রেসের শিবিরকে দুরমুশ করে দিয়েছে তাকে মহাকাব্যিক জয় বললেও হয়তো অনেক কম বলা হয়।

তবে শুধু এই বারই না, ভারতীয় জনতা পার্টি মহারাষ্ট্র জয় করেছিল ২০১৯ সালেও। ২০১৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-শিবসেনা (অবিভক্ত) জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। কিন্তু সেই জোট বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, সারা ভারত ও দেশের বাইরে ভারত সম্পর্কে আগ্রহীদের একরকম বিস্মিত ও হতবাক করে দিয়ে শিবসেনা বেরিয়ে যায় জাতীয়তাবাদী শিবির থেকে। এক সময় যে প্রাতঃস্মরণীয় বালাসাহেব ঠাকরের হাতে নিরাপদ থাকতো মহারাষ্ট্রের হিন্দুরা, সেই বালাসাহেব ঠাকরের ছেলে উদ্ধব ঠাকরের হিন্দুত্বের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা মেনে নিতে পারেনি কেউই, মেনে নিতে পারেনি খোদ তার দলের নেতা-কর্মীরাও। শিবসেনা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় আর এর ফলে গত পাঁচ বছরে রাজ্যটি তিনজন মুখ্যমন্ত্রী দেখে ফেলেছে: বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবীস, শিবসেনার (উদ্ধব বালঠাকরে গোষ্ঠী) উদ্ধব ঠাকরে এবং শিবসেনার (শিন্ডে গোষ্ঠী) একনাথ শিন্ডে।

সন্ন্যাসী হত্যা সহ একাধিক কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটে যায় মহারাষ্ট্র জুড়ে।

এই রাজনৈতিক অস্থিরতার দায় কিছুটা হয়তো কেন্দ্রীয় সরকারের উপরেও পড়ে যায়। এছাড়াও বালাসাহেব ঠাকরে আর তার শিবসেনা দল মহারাষ্ট্রের এক প্রকার আবেগ বললেও ভুল বলা হয় না। সেই শিবসেনা ভেঙে যাওয়াটাও হয়তো সাধারন মানুষ মেনে নিতে পারেনি। তাই হয়তো কিছুটা সহানুভূতির ভোটও পেয়েছিল উদ্ধব ঠাকরে তথা কংগ্রেসী পক্ষ। বালা সাহেবের শিবসেনা আর উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা যে এক নয় সেটা বুঝতে মানুষের সময় লেগে গেছে এই বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত। এবং যখনই তারা সেটা বুঝতে পারল তার ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হলো ভোটযন্ত্রে। আর সাধারণ মানুষের ভুল ভেঙ্গে যাওয়ার ফলাফল কী হল? জাতীয়তাবাদী মহায়ুতি জোট ২৮৮ সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় ২৩৩টি আসনে ঐতিহাসিক বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে। বিজেপি মহায়ুতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসন (১৩২টি) জিতে এই জয়ের নেতৃত্ব দিয়েছে। শিন্ডের শিবসেনা ৫৭টি আসন এবং অজিত পাওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি ৪১টি আসন জিতেছে। এদিকে সরকার গড়তে মহারাষ্ট্রে লাগে ১৪৫ টি আসন। মানে যদি অংকের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় শিবসেনা গোষ্ঠী বিজেপির সাথে নাও থাকে, তবুও অনায়াসে সরকার গড়ে ফেলবে বিজেপি। আর এই রাজ্যেই কিনা তারা জোর ধাক্কা খেয়েছিল লোকসভা নির্বাচনে। এইভাবেও ফিরে আসা যায়।

বিজেপি, অজিত পাওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি গোষ্ঠী এবং মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের শিবসেনা গোষ্ঠীর জোট — মহায়ুতি — মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক বিজয় অর্জন করেছে। এই জোট প্রায় ৫০% ভোট পেয়েছে। কোঙ্কন, উত্তর মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম মহারাষ্ট্র অঞ্চলে তাদের ভোট অর্ধেকেরও বেশি ছাড়িয়ে গেছে। মহায়ুতি মহারাষ্ট্রের প্রতিটি অঞ্চলে তাদের ভোট শেয়ার বাড়িয়েছে, অন্যদিকে মহা বিকাশ আঘাদি (এমভিএ) — কংগ্রেস, উদ্ধব ঠাকরে শিবসেনা গোষ্ঠী এবং শরদ পাওয়ারের এনসিপির জোট — পুরো রাজ্যেই তাদের সমর্থন হারিয়েছে। বিজেপি জোটের মোট আসন সংখ্যা এমভিএর চেয়ে প্রায় পাঁচ গুণ বেশি, যেখানে এমভিএ সব মিলিয়ে মাত্র ৫০টি মত আসন পেয়েছে।

এই জয়ের পেছনে কাজ করেছে বেশ কিছু ফ্যাক্টর

ভারতবর্ষে সমাজে মহিলাদের গুরুত্ব অপরিসীম। যে সমাজে মহিলারা কর্মক্ষম হয় না, ঘরে বসে থাকে সেই সমাজ আদতে এক ডানাওয়ালা পাখির মত উড়তে অক্ষম হয়ে যায়। আর তাই বিজেপি জোট জোর দিয়েছিল নারী উন্নয়নের উপরে। চালু হয় "লাড়কি বহিন যোজনা" প্রকল্প। মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান সরকারের অধীনে সফল হওয়া এই প্রকল্পটি মহায়ুতি সরকার মহারাষ্ট্রেও কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই প্রকল্পের অধীনে জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চার মাসে মহারাষ্ট্রের এক কোটিরও বেশি নারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা জমা হয়। ভোটের পর থেকে এই টাকার পরিমাণ বেড়ে ২,১০০ হবে। রাজ্য সরকারের এই বছরের বাজেটে মোট ৬.১২ লাখ কোটি টাকার ব্যয়ের মধ্যে ৪৬,০০০ কোটি টাকা (মোট ব্যয়ের ৭.৫ শতাংশ) "লাড়কি বহিন" প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। মহায়ুতি সরকার নারীদের জন্য আরও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তারা বছরে তিনটি বিনামূল্যের গ্যাস সিলিন্ডারের সুবিধাও দিয়েছে। আর এই প্রকল্প যে কতটা সফল হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়, ভোট দেওয়ার হার দেখে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৬৬ শতাংশ, যেখানে নারীরা অর্ধেকেরও বেশি অংশগ্রহণ করেছেন। এর আগের দুই ভোটে যা ছিলো ৬১ শতাংশ।

মহায়ুতির বিজয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো মারাঠা সম্প্রদায়ের ভোট বিভাজন এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের ভোট বিজেপি জোটের দিকে সরে আসা। দ্বিতীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার এবং মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে দুজনেই মারাঠা। ফলে এমভিএ মারাঠা সম্প্রদায়ের ভোট তেমন পায়নি, এবং ওবিসি ভোটও এবার বিজেপির পক্ষে গেছে। এছাড়াও কৃষকদের জন্য বিদ্যুৎ বিল মওকুফ এবং ফসল বীমা প্রকল্প চালু করা হয়। প্রায় ৭০ শতাংশ পরিবারের জন্য বিনামূল্যে বা সস্তায় খাদ্যশস্য বিতরণের প্রকল্প কার্যকর করা হয়েছে সেখানে। ফলে সাধারণ মানুষ দুই হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছে বিজেপি জোটকে। এই নির্বাচনে জাতীয়তাবাদীদের বিজয়ের অপর একটি কারণ ছিল আরএসএস-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ। সংঘ গত চার-পাঁচ মাসে শত শত বৈঠক করেছে এবং হাজার হাজার লোককে সংগঠিত করেছে। যার ফল সরাসরি পড়েছে ভোট

মহা জয়ের তিন কারিগর

জয়তু দেবেন্দ্র

বাক্সে। মহারাষ্ট্রের মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য দেশবিরোধীদের হাতে ছেড়ে দিতে আরএসএস কখনোই রাজি ছিল না। সাধারণত আরএসএস রাজনীতি নিয়ে মাথায় ঘামায় না, কিন্তু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি আসলে তারাও গোড়ামী দেখিয়ে দূরে সরে থাকে না। মহারাষ্ট্র নির্বাচন হল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিজেপির শক্তিশালী হওয়া ছাড়াও মহারাষ্ট্র নির্বাচন আরো একটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসি শিবিরের লোক উদ্ধব ঠাকরের হাত থেকে হিন্দুত্ব কার্ড কেড়ে নিল মহারাষ্ট্রবাসী। হিন্দুত্বের নাম নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও দেশবিরোধী শক্তিকে শক্তিশালী করতে গিয়ে রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেলেন উদ্ধব। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেল সে। এছাড়াও শরদ পাওয়ারেরও ট্র্যাজিক প্রস্থান হয়ে গেলো ভারতীয় রাজনীতি থেকে।

শুধু মহারাষ্ট্র নয়, দেশজুড়ে চলা উপনির্বাচনগুলিতেও যথেষ্ট দাপট দেখিয়েছে বিজেপি। প্রায় ৫০ টি উপনির্বাচনের বিজেপির জয়জয়কার আর কংগ্রেসের ধ্বস দেখা গেছে। বিজেপি ১১ থেকে ২০-তে উঠে এসেছে অন্যদিকে কংগ্রেস ১৩ থেকে নেমে এসেছে ৭-এ। যে উত্তর প্রদেশে বিগত লোকসভায় বড় ধাক্কা খেয়েছিল বিজেপি, সেখানে ন'টার মধ্যে ছয়টা বিজেপি জিতেছে। আর জোট সঙ্গীর একটা সিট ধরলে সাতটাই এসেছে জাতীয়তাবাদীদের ঝুলিতে। এই উত্তরপ্রদেশের উপনির্বাচনে বিজেপির স্লোগান ছিল "এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়" অর্থ্যাৎ একত্রিত থাকলে আমরা নিরাপদ থাকব। হিন্দু একতার অন্যতম চমক দেখা গেছে এই উত্তর প্রদেশেই। মুসলিম-প্রধান (৬৫ শতাংশ) কুন্দারকি বিধানসভা অঞ্চলে বিজেপি প্রার্থী রামবীর ঠাকুর ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছেন। তিনি তার ১১ জন মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী এবং বর্তমান সাংসদ হাজি রিজওয়ান। রামবীর হাজি রিজওয়ানকে এক লক্ষেরও বেশি ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটারের অধ্যুষিত এই আসনে তার এই জয় সারা ভারতের সামনে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো।

তবে হ্যাঁ সবকিছুই একেবারে ভালো হয়নি। তাল কেটেছে পূর্ব ভারতে এসে। যদিও ঝাড়খন্ডে বিজেপির ভোট সংখ্যা খুব একটা খারাপ হয়নি কিন্তু আসন সংখ্যার নিরিখে বিজেপি হেরে গেছে। হিন্দু একতা ঝাড়খন্ডে এসে আপাতভাবে থেমে যেতে ব্যর্থ হয়েছে, কাজ করে গেছে হেমন্ত সোরেনের 'আদিবাসী অস্মিতা'। বাটোগে তো কাটোগে এর মর্ম বুঝতে ঝাড়খন্ডের হয়তো আরেকটু সময় লাগবে। এছাড়াও সদ্য জেল থেকে ছাড়া পাওয়ায় সহানুভূতির হাওয়াও বহুলাংশে কাজ করেছিল হেমন্ত সোরেনের উপরে। ভারতের রাজনীতিতে সহানুভূতির হাওয়া যে খুব একটা ফেলনা নয় তা কিন্তু বারবার প্রমাণিত হয়েছে। তা সে ইন্দিরা গান্ধী হত্যা হোক বা হেমন্ত সোরেনের জেলযাত্রা।

জাতীয়তাবাদী শক্তি প্রচন্ড ধাক্কা খেয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। এখানে ছয়টি উপনির্বাচনে ছটিতেই জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তার মধ্যে আবার একটা আসন বিজেপির থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। প্রতিটা আসনেই তারা আগের বারের থেকে ব্যবধান অনেক বাড়িয়ে নিয়েছে। সিতাইয়ে তিন বছরে ৭২ হাজার ৪৪৮ ভোট কমেছে বিজেপির। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি সীমান্তবর্তী রাজ্যে জাতীয়তাবাদীদের এই পরাজয় কিন্তু মোটেও সারা ভারতের জন্য ভালো লক্ষণ নয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হাড়োয়াতে নিজেদের দল আইএসএফকেও ভোট দেয়নি মুসলিমরা। বিজেপিকে কোনোভাবেই জিততে দেওয়া যাবে না এই লক্ষ্য নিয়ে মুসলিমরা সব ভোট দিয়েছে তৃণমূলকে। এই জাতিগত ঐক্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কবে দেখাতে পারবে তা হয়তো শুধু ভগবানই জানেন।

এই উপনির্বাচনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ওয়ানাড়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বিজয়। সারা ভারত জুড়ে যখন চেষ্টা করা হচ্ছে পরিবারতন্ত্রের মতো কায়েমী স্বার্থকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে, সমস্ত ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতায় যোগ্যদের তুলে আনতে, সেখানে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর এই জয় বিজেপির পরিবারতন্ত্রবিহীন নতুন ভারত নির্মাণের স্বপ্নকে একটু হলেও ধাক্কা দিল।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পূর্ব ভারত বাদে বাকি ভারতে বিজেপি আবার স্বমহিমায় ফিরে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডকে নিয়ে এবার একটু বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে বিজেপির চিন্তন শিবিরকে। নয়তো সামনে যে সারা ভারতের সামনে বড় বিপদ।

ওয়াকফ না মগের মুলুক

বিনয়ভূষণ দাশ

কংগ্রেসের তৈরি ওয়াকফ বোর্ড যদি ভাবে যে, কোনও জমি মুসলমানের, তাহলে সেই জমি স্বাভাবিকভাবেই ওয়াকফ সম্পত্তি। আর এক্ষেত্রে ওয়াকফ বোর্ড-এর ভাবাটাই যথেষ্ট, কোনও প্রমাণের দরকার নেই। যদি ওয়াকফ বোর্ড ভাবে যে, আপনার সম্পত্তি আপনার নয়, ওয়াকফের; তাহলে সেটি ওয়াকফের বলেই গণ্য হবে। এটা কি মগের মুলুক!

অতি সম্প্রতি কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারের ওয়াকফ ও পর্যটন দফতরের মন্ত্রী জামির আহমদ খাঁ এক ভিডিও বার্তায় তাঁর দফতরের সমস্ত আধিকারিক, ভুমি রাজস্ব দফতর, সংখ্যালঘু কল্যাণ দফতর ও ওয়াকফ বোর্ডকে নির্দেশ দেন, বিজ্ঞপ্তি জারী করে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার করার (উদ্ধার করার নামে) নোটিস জারী করতে হবে। উক্ত ভিডিওতে জামির উল্লেখ করেন যে, তিনি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার নির্দেশেই এই নোটিস জারী করেছেন। এই বিষয়টি সংবাদে প্রকাশ হতেই রাজ্যের বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী এমপি রেনুকাচার্য এই নির্দেশের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে নির্দেশটি প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেন। তিনি আরও দাবী করেন, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার সমর্থনেই জামির আহমদ কৃষক ও বিভিন্ন মন্দিরের জমি ওয়াকফের নামে দখলের চক্রান্ত করেছেন।

এই দখলদারী নোটিশের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রাজ্যব্যাপী এই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় এবং রাজ্যে উপ-নির্বাচনে সম্ভাব্য ফলাফলের কথা ভেবে শনিবার ২ নভেম্বর কৃষকদের কাছে পাঠানো সমস্ত নোটিস প্রত্যাহার করার নির্দেশ জারি করতে বাধ্য হয় সরকার। উপনির্বাচনের মুখে রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের এই পিছিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছে সিদ্ধারামাইয়া তথা কংগ্রেস সরকারকে। আসলে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এবং ইন্ডি- জোট কর্ণাটক এবং কেরালা রাজ্যকে তাঁদের যাবতীয় দেশ বিরোধী কার্যকলাপের পরীক্ষা- নিরীক্ষার গবেষণাগারে পরিণত করেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত 'ওয়াকফ আইন' সংশোধনী ২০২৪-এর প্রবল বিরোধী এই কংগ্রেস এবং ইন্ডি-জোট । তাঁরা এই কার্যকলাপের মাধ্যমে মুসলিম মানসিকতার ধাঁচটা বুঝে নিতে চাইছে। তাই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার ইশারাতেই তাঁর মন্ত্রী জামির আহমদ খাঁ এমন নির্দেশিকা জারি করতে সাহস পান। রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং কৃষকেরা অবশ্য মুখের মত জবাব দিয়েছে সিদ্ধারামাইয়াকে।

কেরালার পিনারাই বিজয়নের সিপিএম সরকারও একই ধরণের ওয়াকফ

কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে। রাজ্যের মুনাম্বর ওয়াকফ জমি বিতর্ক, এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সম্প্রতি কেরালার উপকূলবর্তী এর্ণাকুলাম জেলার ৬১০টি পরিবারের জমি তাঁদের বলে দাবী করে ওয়াকফ বোর্ড বিজ্ঞপ্তি জারী করেছে। এমনকি ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও প্রকাশ্যে ওয়াকফ বোর্ডের এই দখলদারীর বিরোধিতা করেছে। এখানে এটাও উল্লেখ্য যে, কেরালার ক্যাথলিক চার্চ গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধন বিলকে সমর্থন করেছে। ৬১০ টি পরিবারের বিষয়টি বর্তমানে কেরালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচারাধীন । আবার জেপিসিতে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতলামি করে কাঁচের গ্লাস ভাঙ্গাও সেই ওয়াকফ আইনকে কেন্দ্র করেই।

যাইহোক, এখানে বিশেষভাবে বলার কথা হল, ওয়াকফ আইনের মাধ্যমে হিন্দু, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সমস্ত অমুসলিম সম্প্রদায়ের জমি, সম্পত্তি অবৈধভাবে কুক্ষিগত করার হাতিয়ার হল এই ওয়াকফ আইন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, ওয়াকফ আইনটি কি এবং আইনটি সংবিধান বহির্ভূত এত ক্ষমতাই বা পেল কিভাবে।

ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ একটি প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্টার দলিল। আইনটি প্রথমে ভারতবর্ষে চালু করেন তথাকথিত প্রগতিশীলতার নামাবলী গায়ে চড়ানো কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। আইনটি চালু করা হয় মুসলিমদের মসজিদ, কবরখানা, দরগা ইত্যাদি যথাযথ পরিচালনার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে। এই আইনটির স্থানে পরবর্তীকালে 'ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫, চালু করা হয় কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাওয়ের আমলে। ওয়াকফ আইনের এই সংশোধনের মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডকে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী করে দেওয়া হয়। ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ এর ঘোষিত উদ্দেশ্য হল, ওয়াকফ সম্পত্তির যথাযথ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা। এই আইন বলে একটি কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডসমুহ, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও ওয়াকফ বোর্ডসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান সহ সব সদস্যই কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়। আবার ২০১৩ সালে এই আইনটি সংশোধন করে ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে যে কারও সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার সীমাহীন অধিকার দেওয়া হয়। আর ওয়াকফ বোর্ডের এই দখলদারিত্ব দেশের কোন বিচারালয়ে ' চ্যালেঞ্জ' করাও যাবে না।

কেরলে চেরাই গ্রাম গোটাটাই দাবি করেছে ওয়াকফ বোর্ড।

এমনকি এই আইনের বলে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দিল্লীর ১২৩ টি মহার্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডকে 'ভেট' দেয় । আর এই কালো আইনের সাহায্যে হিন্দুদের মালিকানাধীন হাজার হাজার একর জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমনকি, সম্প্রতি তামিলনাডু ওয়াকফ বোর্ড ওই রাজ্যের ৬ টি গ্রামসহ একটি ১৫০০ বছরের পুরাতন হিন্দু মন্দিরকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এমনকি আমাদের এই রাজ্যের মুর্শিদাবাদসহ কয়েকটি জেলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে বেশ কিছু সরকারী সম্পত্তিকে ভূমি রাজস্ব দফতরের রেকর্ডে কোন অদৃশ্য হাতের অঙ্গুলিহেলনে ওয়াকফ এবং মসজিদের জমি হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। আসলে এসব সঠিকভাবে জানতে হলে আমাদের ইতিহাস ঘাঁটা ছাড়া উপায় নেই। কিভাবে ওয়াকফ বোর্ড এই সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হল ? আসলে, যে সমস্ত হিন্দুরা দেশভাগের পরে পাকিস্তান থেকে বিভক্ত দেশের এই অবশিষ্ট অংশে এল তাঁদের উত্তরাধিকার সুত্রে অর্জিত সমস্ত ফেলে, সেই সমস্ত সম্পত্তি পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশের সরকার ও মুসলমানেরা দখল করে নেয়; অনেকটা গণিমতের মালের মত। কিন্তু আমাদের দেশের মহান ধর্মনিরপেক্ষ, মহানুভবতার ভেকধারী জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস সরকার ভারতে পরিত্যক্ত মুসলিম সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডকে সমর্পণ করে। আগেই উল্লেখ করেছি, ওয়াকফ বোর্ড আইন,১৯৯৫ এর মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডকে যে কারও সম্পত্তি কেবলমাত্র মৌখিক ঘোষণার দ্বারাই ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষনার সীমাহীন অধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তিও অনেক বেড়ে যায়।

Management System of India-র প্রদত্ত এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়,বর্তমানে ভারতে ওয়াকফ বোর্ডের মোট সম্পত্তি ৮৫৪৫০৯ টি। আর এই সম্পত্তিগুলি মোট আট লাখেরও বেশী একর জমির উপর ছড়িয়ে আছে। আর অবাক করার বিষয় হল, এই পরিমাণ জমি দেশে সৈন্য বিভাগ ও রেল বিভাগের পরেই। আরও স্তম্ভিত হওয়ার বিষয় হল, বর্তমান পাকিস্তানের মোট জমির আয়তনের থেকেও অনেক বেশী জমি ভারতে ওয়াকফ বোর্ডের এক্তিয়ারে আছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভারতের মধ্যেই পাকিস্তানের চেয়েও একটি বড় পাকিস্তান অবস্থান করছে। ২০০৯ সালের একটি

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ওয়াকফ সম্পত্তি চার লাখ একরেরও বেশী জমির উপর ছড়িয়ে আছে। আর সেই জমির পরিমাণ এরই মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অথচ, দেশের মোট জমির পরিমাণ একই আছে। তাহলে কোথা থেকে ওয়াকফ বোর্ডের অধীন জমির পরিমাণ দ্বিগুণ হল?

আসলে, ওয়াকফ বোর্ড যে কোন সম্পত্তি, তা সে সরকারের হোক, অথবা কোন হিন্দু বা খ্রিস্টানের হোক, মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে অধিকার করে নিচ্ছে। দিনের পর দিন চলছে এই জবরদখল। কখনও ওয়াকফ বোর্ড কবরখানার সংলগ্ন সরকারী বা হিন্দুদের জমি ঘিরে নিয়ে তাকে ওয়াকফ হিসেবে দেখাচ্ছে; আবার কখনও ভগ্ন দেবালয় বা মসজিদ মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে ওয়াকফ হিসেবে চিহ্নিত করে নিচ্ছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সংলগ্ন অঞ্চলেও এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। সাধারণ মানুষ এটাকে জবরদখল বললেও ওয়াকফ বোর্ডের কিন্তু অধিকার রয়েছে এই অবৈধ দখলদারিত্বে। ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ এর সেকশন ৩-এ বলা হয়েছে, যদি ওয়াকফ বোর্ড ভাবে যে, কোনও জমি মুসলমানের, তাহলে সেই জমি স্বাভাবিকভাবেই ওয়াকফ সম্পত্তি। আর এ ক্ষেত্রে ওয়াকফ বোর্ডএর ভাবাটাই যথেষ্ট, কোন প্রমাণের দরকার নেই। যদি ওয়াকফ বোর্ড ভাবে যে, আপনার সম্পত্তি আপনার নয়, ওয়াকফের; তাহলে সেটি ওয়াকফের বলেই গণ্য হবে, সেক্ষেত্রে আপনি কোনও আদালতে যেতে পারবেন না; আপনাকে যেতে হবে সেই ওয়াকফ বোর্ডের কাছেই, যারা আপনার জমি বা সম্পত্তি 'অবৈধভাবে ওয়াকফ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ, তাঁদেরই দয়ার উপর আপনাকে নির্ভর করতে হবে। আবার ওয়াকফ আইনের ৮৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যদি আপনি ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে প্রমাণ করতে না পারেন যে জমিটি আপনার তাহলে আপনাকে জমিটি খালি করে দিতে হুকুম দেবে ওয়াকফ বোর্ড। আর এক্ষেত্রে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোন বিচারালয়, এমনকি সুপ্রিম কোর্টও ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবে না। অর্থাৎ, ওয়াকফ বোর্ড যদি কোন জমি তাঁদের বলে ঘোষণা করে, তাহলে ওয়াকফ বোর্ডই সেই জমির মালিক বনে যাবে।

এখানে ভাববার বিষয় হল, ভারতের মত একটি কথিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ওয়াকফ আইনের মত একটি Draconian law বা কালা কানুন প্রযুক্ত হতে পারে? আর প্রশ্ন হল, এই দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, বা খ্রিস্টানদের জন্য কেন এই ধরণের আইন নেই? শুধু মুসলিমদের জন্যই বা কেন? আর মজার ব্যাপার হল, এই আইন ভারতেও থাকলেও বিভিন্ন মুসলিম দেশ যেমন তুরস্ক, লিবিয়া, মিশর, সুদান, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডন বা ইরাকের মত দেশে কিন্তু কোন ওয়াকফ বোর্ড বা ওয়াকফ আইন নেই। একজন বিশ্লেষক তো বলেই দিয়েছেন, ওয়াকফ বোর্ডের কাজই হল, ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদকে সম্প্রসারণ করা। আর উক্ত কারণ সমূহের জন্যই দেশের বর্তমান বিজেপি সরকার ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ সংশোধন করতে চেয়ে প্রস্তাবিত 'ওয়াকফ (সংশোধন) বিল ২০২৪' সংসদে পেশ করেছে।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আফতাব আলম এক প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, ওয়াকফ বোর্ডে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না, ওয়াকফ বোর্ডের প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা অত্যন্ত বেহাল এবং তা দ্রুত সংশোধন করা প্রয়োজন। তিনি এটাও স্বীকার করেছেন, ওয়াকফ বোর্ড দেশের তৃতীয় বৃহত্তম জমি মালিক। প্রস্তাবিত আইনে ৪৪ টি সংশোধনী আনা হয়েছে। সরকারী তরফে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত আইনটির উদ্দেশ্য হল ওয়াকফ বোর্ডের ৮.৭ লক্ষের বেশী ওয়াকফ সম্পত্তির কাজে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা আনা। এ ছাড়া ওয়াকফ বোর্ডকে দুর্নীতিমুক্ত করা। বিলটিতে অমুসলিমকেও ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কোন সম্পত্তিকে 'ওয়াকফ' ঘোষণা করা হবে সেই ব্যাপারে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের জায়গায় জেলা কালেক্টরকে প্রভুত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোন সরকারী সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষিত হয়ে থাকলে সেটা প্রস্তাবিত আইনে আর ওয়াকফ সম্পত্তি থাকবে না। প্রস্তাবিত আইনে ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ এর ৪০ নং অনুচ্ছেদটি যাতে ওয়াকফ বোর্ডকে যে কোন সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তাও রদ করার কথা বলা হয়েছে।

এই আইনটির মাধ্যমে প্রায় ৭৩,১৯৬ টি বিবাদাস্পদ সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে ওয়াকফ ঘোষণার অনুচ্ছেদটিও বাতিল করা হবে। তাছাড়া এক বিশাল পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে যার কোন বৈধ দলিলপত্তর নেই, যেগুলি বিভিন্ন সময়ে জোর করে ওয়াকফ বলে দখল করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে বৈধ ওয়াকফনামা না থাকলে তাকে (সেই সম্পত্তিকে) বিবাদিত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জেলা কালেক্টরকে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে আরও নানা সংস্থান রাখা হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই রে রে করে উঠেছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড, জামায়েত-উলেমা- ই- হিন্দসহ আরও কিছু উগ্রপন্থী মুসলিম সংগঠন। তাঁরা এই বিলটি প্রত্যাহার করার দাবি করেছে। তাছাড়া ভারতে মুসলিম স্বার্থের তল্পিবাহক কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল প্রস্তাবিত এই আইনের বিরোধিতায় যূথবদ্ধ হল্লাবুলায় নেমেছে- স্বভাবনুযায়ী এবং মুসলিম ভোটের টানে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ওয়াকফের নামে এই 'মগের মুলুক' আর কতদিন?

পশ্চিমবঙ্গ কি এবার বাংলাদেশ হওয়ার পথে?

অগ্নিকিশোর দত্ত

এতদিন যখন পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হত তখন অনেকে ব্যঙ্গ করে বলতো যে যতক্ষণ না কলকাতায় ঘটছে ততক্ষণ বাঙালির ঘুম ভাঙবে না। দুঃখজনক সেই ঘটনা ঘটল কলকাতার বুকে। আক্রান্ত হল বাঙালির আরাধ্যা দেবীমূর্তি। ভাঙবে এবার বাঙালির মরণঘুম!

এতদিন বাংলাদেশ বললে আমাদের মনে যে ছবিগুলো ভেসে উঠতো তার মধ্যে অন্যতম হলো পুজোর সময় মূর্তি ভাঙ্গা। প্রতিবছর দুর্গাপূজা বা কালীপূজার সময় হিন্দুরা যখন মেতে ওঠে দেবী আরাধনায়, ঠিক তখনই অন্য একটি সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তরা মেতে ওঠে তাদের নিজেদের উৎসবে আর তা হল হিন্দুদের আরাধ্য দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙ্গা উৎসব। কারণ মূর্তি ভাঙ্গা তাদের কাছে পুণ্যের কাজ। এছাড়াও সামাজিক আগ্রাসন তো আছেই। প্রতিনিয়ত হিন্দুদের ধর্মে আঘাত করে তারা বুঝিয়ে দেয় যে ওই দেশে হিন্দুরা বর্তমানে তাদের তুলনায় নিচু শ্রেণির নাগরিক হয়ে গেছে।

দেশটা তাদের, শাসনতন্ত্র সরকার সবই তাদের, হিন্দুদের তারা দয়া করে থাকতে দিচ্ছে আর সেজন্য তাদের ধর্মে নিষিদ্ধ মূর্তি পূজো যদি হিন্দুরা করে তবে সেই মূর্তি ভেঙে নিজেদের ধর্ম পালন করার অধিকার তাদের আছে। বাংলাদেশে দুর্গাপুজো কালীপুজো বললে এতদিন আমাদের চোখের সামনে এই ছবিটাই ভেসে আসতো। কিন্তু এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ বললে হয়তো বাকি ভারত ও সারা পৃথিবীর সামনে ঠিক এই ছবিটিই ভেসে উঠবে। কারণ পুজোর মরশুম আসলেই মূর্তি ভাঙার উৎসব পশ্চিমবঙ্গেও এবার নিয়মিতভাবে শুরু হয়ে গেল। দুর্গাপুজোতে তো হয়েইছিল, বিগত কালী পূজোতেও পশ্চিমবঙ্গে যত পূজা মন্ডপে হামলা হয়েছে তা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৈরি করা এই হিন্দু হোমল্যান্ডে আক্ষরিক অর্থেই একসময় অকল্পনীয় ছিলো।

প্রয়াত অরাজনৈতিক নেতৃত্ব তপন ঘোষ একটি কথা সব সময় বলতেন। নিজেদের ধর্মগ্রন্থের থেকেও বেশি করে পড়া উচিত তাদের ধর্মগ্রন্থ, যারা আমাদের হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতিবেশী। কারণ তাহলে আমরা আমাদের প্রতিবেশীর স্বভাব চরিত্র এবং সবথেকে বড় কথা আমাদের প্রতি তাদের মনোভাব সম্পর্কে বিশদে জানতে পারবো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমরা সেটা করি না। আমরা আমাদের ঘরের বাইরে তাকাই না, আমরা আমাদের প্রতিবেশীকেও আমাদের মতই পরমতসহিষ্ণু মনে করি। আর যে সারল্যের ফলাফল হলো হিন্দু হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গেরও বাংলাদেশে পরিণত হওয়া এইবার কালী পূজাতে আক্ষরিক অর্থেই বেশ কিছু জায়গা থেকে কালীপুজোর মন্ডপ এবং কালীমূর্তি ভাঙচুর করার সংবাদ এসেছে। এবং তার থেকেও বিপজ্জনক বিষয় হলো প্রশাসনের তরফ থেকে এইসব ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা হয়। যেখানে কিনা প্রশাসনের উচিত ছিল অপরাধীদের গ্রেফতার করে জনগণকে ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তা দেওয়া।

রাজাবাজার

আমরা রাজাবাজারের কথা যদি ধরি, সেখানে দেখব প্রশাসনের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করে জানানো হচ্ছে যে সেখানে কালীপুজোর শোভাযাত্রার উপরে কোন আক্রমণ হয়নি, সেখানে নাকি দুজন ব্যক্তির বাইক পার্কিং করা নিয়ে ঝামেলা হয়

মাত্র। অথচ যে ভিডিও সামনে এসেছে সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শোভাযাত্রায় হামলা চলছে, পাথর ছোড়া হচ্ছে। একজনের করুণ আর্তনাদও শোনা যাচ্ছে যে নারকেলডাঙ্গার পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে বলে। এখন প্রশ্ন হল, একটি শোভাযাত্রায় আক্রমণ হলে, বা শোভাযাত্রা ছেড়ে দিলাম, কোথাও কোন অপরাধ হলে পুলিশের দায়িত্ব হল অপরদিকে গ্রেপ্তার করা এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া। কিন্তু ক্ষমতার বলয়ের পেছনে ঠিক কোন অংক থাকলে পুলিশ বাধ্য হয় সাম্প্রদায়িক হামলাকে বাইক পার্কিং নিয়ে ঝামেলা বলে ধামাচাপা দিতে সেটা বোধহয় ভেবে দেখা প্রয়োজন।এবং আরো যেটা ভয়াবহ, ডেইলি হান্ট-এ প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়েছে যে সেদিন শুধু পাথর বাজে হয়নি বরং গুলি চালানোও

হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। পরবর্তীতে বিক্ষোভকারীদের সামাল দিতে সেখানে র‍্যাফ পর্যন্ত নামানো হয়, ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেলও। রাজাবাজারের ঘটনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মহল স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। আলোচনা সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে রাজনৈতিক মহলও। এক্স হ্যান্ডেলে বেশ কয়েকটি ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে পুলিশ ও প্রশাসনের সমালোচনা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সরাসরি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, কালীপুজোর ভাসানের শোভাযাত্রা লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে, যা সামাল দিতে ব্যর্থ পুলিশ প্রশাসন। কলকাতা পুলিশ না পারলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দাবি জানান নন্দীগ্রামের বিধায়ক। বৃহত্তর মহলকে এই বিষয়ে সচেতন করতে সেই এক্স পোস্টে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং মাননীয় রাজ্যপালকেও মেনশন করেছেন তিনি।

কলকাতা পোর্ট

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখি কলকাতা পোর্টে। রাতে দুটোর সময় সেখানে এসে লাইট এবং প্যান্ডেল ভাঙচুর চালানো হয়। ভেঙে উল্টে ফেলে দেওয়া হয় কালীমূর্তি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে শোনা গেছে ভক্তদের কান্না। কিন্তু মজাদার ভাবে এখানে প্রশাসন থেকে রীতিমত অফিশিয়াল একাউন্ট থেকে বিবৃতিতে জানানো হয় যে এই ঘটনা কোন সাম্প্রদায়িক হামলা নয়। সাম্প্রদায়িক হামলা না হলে কালী মূর্তি উল্টানোর ঘটনা কেন ঘটতে পারে সেটা হয়তো শুধুমাত্র ওনারাই জানেন। প্রশ্নটা আবারো তোলা উচিত যে প্রশাসন কেন অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এটি কলকাতার গার্ডেনরিচের সিকলাইন এলাকায় ৮০ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত, যার কাউন্সিলর হলেন আনোয়ার খান, এবং এটি কলকাতা পোর্ট বিধানসভা কেন্দ্রে পড়ে, যার বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম। রাতে সেখানে হামলা চালায় অপরাধীরা। মন্দির ও প্যান্ডেলে হামলা হয়। রাজ্যবাসী হিন্দুরা যখন

ঘুমিয়েছিল তখন সিকলাইনে এই সব ঘটছিল। তবুও হিন্দুদের ঘুম এখনো পর্যন্ত ভাঙেনি। হয়তো ভবিষ্যতে অবশ্যই ভাঙবে।

হামলা হয়েছে কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতেও।

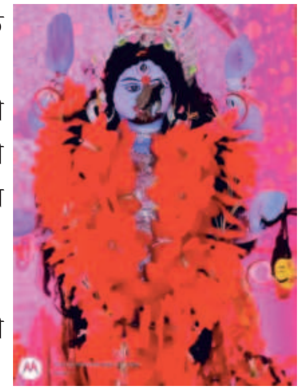

সেখানে রাতের অন্ধকারে কেউ এসে কালী মূর্তি ভেঙে দিয়ে গেছে। খাগড়াবাড়িতে হামলা হওয়া মণ্ডপে বিকৃত করা কালী মূর্তির ছবি আমরা সবাই দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে।

লেকটাউন

কলকাতার লেক টাউনের দক্ষিণ দাড়িতেও ভাঙ্গা হয়েছে মূর্তি। হামলা হয়েছে কলকাতার কাঁচাবাজারেও। এবং এসব কিছুই ঘটেছে মাত্র কিছু ঘন্টার মধ্যেই। এতদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি কথা প্রচলিত ছিল, তা হল কলকাতায় কিছু না ঘটলে বাঙালি মিডিয়া বুদ্ধিজীবীদের নাকি ঘুম ভাঙ্গে না। বন্যা হোক বা দুর্ঘটনা বা অন্য যেকোনো কিছু, যতক্ষণ না সেটা কলকাতাতে ঘটছে ততক্ষণ বুদ্ধিজীবী বা মিডিয়া, কেউই তাকে সেই ভাবে গুরুত্ব দেয় না। কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতা এটাই। এতদিন যখন পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হত, হিন্দুদের উপর আক্রমণ হতো, মন্দিরে আক্রমণ চলত তখন অনেকে ব্যঙ্গ করে বলতো যে যতক্ষণ না কলকাতায় এগুলো ঘটবে ততক্ষণ বাঙালির ঘুম ভাঙবে না। এবং দুঃখজনক এই যে সেই ঘটনা কলকাতার বুকে ঘটেই গেল। খাস কলকাতার বুকে আক্রান্ত হল বাঙালির আরাধ্যা দেবীমূর্তি। এবার দেখা যাক বাঙালির মরণঘুম ভাঙ্গে কিনা।

পশ্চিমবাংলার হিন্দুদের এবার বুঝতে পারা উচিত, নিজেদের অনৈক্যের কারনে আমরা খুব দ্রুত আরেকটি বাংলাদেশ নির্মাণে করতে চলেছি। এখনো সময় আছে, সকল সনাতনীরা সব কিছুর উর্দ্ধে উঠে একত্রিত হোন। নইলে এই নিশ্চিত ধংসের থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

পরিশেষে কবির ভাষায় বলি -

"যতই করো দুর্গাপূজা, যতই ভজ কালী।
সঙ্ঘবদ্ধ না হলে ভাই, হিন্দু হবে খালি।। "

পুনঃ লেখাটি ছাপাতে দেওয়ার মুহূর্তে খবর এসেছে বেলডাঙ্গায় রাসের উৎসবেও একই ধরনের হামলা হয়েছে হিন্দুদের উপরে। এখনও সময় আছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মরে যাওয়ার আগে একবার অন্ততপক্ষে জেগে ওঠো বাঙালি।

রেল 'জিহাদ'!

নাশকতার কোপে ভারতীয় রেল

অভিরূপ ঘোষ

কাঙাল পাকিস্তানের জিহাদি, ২০০২ সালে অক্ষরধাম মন্দির হামলা এবং বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফে বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড ফারহাতুল্লাহ ঘোরি-র হুমকি ভারতে রেল উড়িয়ে দেওয়ার। তারপর একের পর এক রেল নাশকতার চেষ্টা এবং জিহাদিদের সঙ্গে প্রায় 'পাল্লা' দিয়ে বিরোধীদের মোদী বিরোধী আক্রমণ। বিরোধীরা গদির লোভে জিহাদিদের থেকেও বেশী ভারতবিরোধী হয়ে উঠছে। পাশাপাশি প্রতিদিন আরও উন্নত হচ্ছে ভারতীয় রেল।

অনেকে বলে বিজেপি সরকারের আমলে নাকি রেল দুর্ঘটনা অনেক বেড়ে গেছে। অনেকের মতে আগে নাকি রেল সফর অনেক নিরাপদ ছিল আর এখন তা নেই। কিন্তু সত্যিই কী তাই! আসুন একটু তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা যাক।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী ইউপিএ সরকারের ১০ বছরে অর্থাৎ ২০০৪-০৫ সাল থেকে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত ভারতে মোট ট্রেন দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ১৮৫৩। পরবর্তী ১০ বছরে রেলওয়ে ট্র্যাক এবং ট্রেনের পরিমাণ বহু বৃদ্ধি পেলেও দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে নেমে যায় সাতশোরও নিচে। প্রতি কিলোমিটার পিছু ট্রেন চলার পর অ্যাক্সিডেন্টের হিসেবে ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় ২০২৪-২৫ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। সাথে পাল্লা দিয়ে কমতে থাকে দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর সংখ্যাও। ইউপিএ সরকারের আমলে বছরে যেখানে গড়ে ২০০ থেকে ৩০০ মানুষ মারা যেতেন রেল দুর্ঘটনায়, সেখানে ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবর্ষে সরকারিভাবে একজনও রেলের গাফিলতিতে মারা যাননি।

চন্দ্রশেখর গৌড় নামে এক ব্যক্তি তথ্য জানার অধিকার আইনে জানতে চেয়েছিলেন শেষ কয়েক বছরে দেশে কতগুলি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। জানা যায় ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৫৫টি, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ২২টি, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৩৫, ২০২২-২৩ সালে ৪৮টি আর ২০২৩-২৪ সালে ৪০টি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। আপাতদৃষ্টিতে সংখ্যাগুলি অনেক বড় মনে হলেও প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার ট্রেন যাত্রার নিরিখে এগুলিকে বিচার করতে হবে। ইউপিএ সরকারের আমলে রেলগাড়ির সংখ্যা অনেক কম ছিল। রেলের এত লাইনও ছিল না। তবু প্রতি অর্থবর্ষে গড়ে ১৫০ থেকে ২০০টি দুর্ঘটনা শিকার হত ভারতীয় রেল। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সুরেশ প্রভু, পীযূষ গোয়েল বা অশ্বিনী বৈষ্ণবদের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় রেল ধীরে ধীরে হয়ে উঠছিল বিশ্বের নিরাপদতম যাত্রার অন্যতম।

> **সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে গোপন রিপোর্ট আসতে শুরু করে যে বিদেশী শক্তির মদতে দেশের মধ্যে থাকা রাষ্ট্রবিরোধীদের সহায়তায় প্যাসেঞ্জার আর মালবাহী ট্রেনকে লাইনচ্যুত করার একটা ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হবে। রিপোর্ট যে ভুল ছিল না তার প্রমাণও মেলে অনেক।**

এমতাবস্থায় রাষ্ট্রবিরোধীদের হাতে রেল ব্যবস্থার ওপর আঘাত হেনে দেশকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার অন্য কোন রাস্তা ছিল না। আর তারা ঠিক সেই কাজেই ব্রতী হল। এমনিতেই দেশের ভেতরে শত্রুর অভাব নেই। তার উপর পাকিস্তানি মদতপুষ্ট মৌলবাদী জঙ্গি সমেত বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বেড়ে ওঠা সমাজবিরোধীরা যুক্ত হল রেল ব্যবস্থার উপর আক্রমণ করতে। এতদিন এই

আক্রমণ চোরাগোপ্তা এবং মুখোশের পিছন থেকে হলেও রাষ্ট্র ভারতের ক্ষতি করায় ব্যগ্র জঙ্গিরা এবার সামনে আসতে শুরু করল। এর সাম্প্রতিকতম নিদর্শন পাওয়া যায় আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। পাকিস্তানে থাকা মৌলবাদী জঙ্গি ফারহাতুল্লাহ ঘোরি এক ভিডিও বার্তা জারি করে দেশের মধ্যে এবং বাইরে থেকে কাজ করার সমস্ত মৌলবাদীদের নির্দেশ দেয় যাতে ভারতের রেল যোগাযোগের উপর চরম আঘাত হানা যায় তার ব্যবস্থা করতে। দিল্লি মুম্বই সমেত দেশের বাকি অনেক জায়গায় রেলকে লাইনচ্যুত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে খোলাখুলি নির্দেশ দেয় ওই মৌলবাদী জঙ্গি।

সবরমতী এক্সপ্রেস

এর ঠিক পরেই আগস্ট মাসের ১৬ তারিখে উত্তরপ্রদেশের কানপুর এর কাছে রেল লাইনের ওপর ভারী ভারী বোল্ডার দেখে লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করা হয় সবরমতী এক্সপ্রেসকে।

হাওড়া মুম্বই এক্সপ্রেস

একই রকম ঘটনা ঘটানো হয়েছিল জুলাই মাসের শেষে হাওড়া মুম্বই এক্সপ্রেসের সাথে। ওই মাসে ৩০ তারিখ ঝাড়খণ্ডের টাটানগর এর কাছে রেললাইনে ভারী ভারী বোল্ডার রেখে লাইনচ্যুত করার চেষ্টা হয় কলকাতা থেকে মুম্বাই যাওয়ার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনকে।

সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে গোপন রিপোর্ট আসতে শুরু করে যে বিদেশী শক্তির মদতে দেশের মধ্যে থাকা রাষ্ট্রবিরোধীদের সহায়তায় প্যাসেঞ্জার আর মালবাহী ট্রেনকে লাইনচ্যুত করার একটা ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হবে। রিপোর্ট যে ভুল ছিল না তার প্রমাণও মেলে অনেক।

দুন এক্সপ্রেস

সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখে দুন এক্সপ্রেস পেরোনোর ঠিক আগে বিলাসপুর রোড এবং রুদ্রপুরের মাঝামাঝি সাত ফুট লম্বা একটি ভারী লোহার পাত কেউ বা কারা রেখে দিয়েছিল রেল লাইনের উপরে। লোকো পাইলট দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে ইমারজেন্সি ব্রেকের সহায়তায় কোনভাবে দুর্ঘটনায় এড়ান।

বান্দ্রা গরীবরথ এক্সপ্রেস

২১ সেপ্টেম্বর তারিখ বান্দ্রা গরীব রথ এক্সপ্রেস পাস হবার ঠিক আগে সুরাট স্টেশনে ঢোকার মুখে রেল লাইনের ফিসপ্লেট খুলে দিয়েছিল আতঙ্কবাদীরা। ঠিক সময় রেল কর্মীরা তা দেখতে না পেলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল। ঠিক পরের দিন ২২ তারিখ উত্তরপ্রদেশের কানপুর জেলার প্রেমপুর স্টেশনের আগে মালগাড়ির চালক দেখতে পান রেল লাইনে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা। তিনি কোনভাবে ট্রেন আটকান। চালক সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে কি হতে পারত সেটা সহজেই অনুমেয়।

ওই মাসেরই ২৩ থেকে ২৫ তারিখ দেশের অন্তত ৪-৫ জায়গায় ট্রেনের লাল বা সবুজ সিগন্যালকে কাগজ বা কাপড় দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেওয়া হয় যাতে চালক দেখতে না পেয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়।

লখনৌ চাপড়া এক্সপ্রেস

২৮ সেপ্টেম্বর বালিয়া স্টেশনের কাছে লখনৌ চাপড়া এক্সপ্রেসকে লাইনচ্যুত করার জন্য বড় বড় বোল্ডার ফেলে রাখা হয় ট্রেন লাইনের উপর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বোল্ডারগুলির সাইজ এতটাই বড় ছিল যা কোন একজনের পক্ষে ওইখানে বয়ে আনা সম্ভব ছিল না।

ঝাঁসি-প্রয়াগরাজ লোকাল

একই দিনে একই কায়দায় প্রায় একই সময়ে ঝাঁসি-প্রয়াগরাজ লোকালকে লাইনচ্যুত করার জন্য একইভাবে বোল্ডার রেখে দেওয়া হয় লাইনের উপর। দুটি ক্ষেত্রেই চালক এবং রেল কর্মীদের সজাগ দৃষ্টি দুর্ঘটনা এবং অনেক নিরীহ মানুষের প্রাণ যাওয়া আটকায়। সরকারি তথ্য অনুসারে শুধু সেপ্টেম্বর মাসের আগে পরেই কমপক্ষে ২৪ বার রেল দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কখনো রেললাইনে সিমেন্টের ব্যাগ রেখে, কখনো সাইকেল রেখে, কখনো ফিসপ্লেট খুলে দিয়ে, কখনো মোটা মোটা লোহার পাত রেখে, কখনো লাইন কেটে আর কখনো বা সিলিন্ডার রেখে অন্তর্ঘাতের চেষ্টা হচ্ছে ক্রমাগত, যদিও স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় রেলকর্মীদের তৎপরতায় অধিকাংশ চেষ্টা ব্যর্থ হলেও কখনো কখনো সফল হয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধীরা, ঘটে যাচ্ছে দুর্ঘটনা। আর তারপর তা নিয়ে মিডিয়া উত্তাল হচ্ছে। বিজেপির রাজনৈতিক ক্ষতি করতে রাষ্ট্র বিরোধীরা এতটাই উদগ্রীব হয়ে উঠেছে যে তারা দেশের এবং দেশের সাধারণ জনগণের বিপদ ডেকে আনতে একটুও পিছপা হচ্ছে না।

এমনিতে বিজেপি সরকারের আমলে আমূল বদলে গেছে ভারতীয় রেল। এক সময় মলমূত্র এবং নোংরা আবর্জনায় ভরে থাকত স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মগুলি। একই অবস্থা ছিল লোকাল থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনের কামড়াগুলোরও। বিজেপি সরকারের আমলে পুরো ব্যবস্থাটা শুধু স্বচ্ছ হয়েছে তাই নয়, হয়েছে অনেক উন্নত এবং আধুনিক। স্টেশনে বসেছে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড। উন্নত দেশগুলোর মত স্টেশনে চলছে লিফট এবং চলমান সিঁড়ি। রেলের কোচগুলো করা হয়েছে আধুনিক এবং অধিকতর সুরক্ষিত। শুরু হয়েছে ট্রেনের সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য তৈরি কবচ ব্যবস্থার ট্রায়াল। আর এসব কিছুই করা হচ্ছে রেলের ভাড়া প্রায় না বাড়িয়েই।

স্বভাবতই রেলের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা দিনে দিনে বেড়েছে। এই অবস্থায় বারবার নাশকতার চেষ্টা করে শুধু যে রাষ্ট্রের সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে তাই নয়, আঘাত করা হচ্ছে মানুষের নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাসকে। পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যান নি যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আনার পর টার্গেট করে সব থেকে বেশি ভাঙচুর করা হয়েছিল রেলেই। প্রকাশ্যে। আজ কিছু বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তায় তারা আবার জেগে উঠেছে। শুরু হয়েছে এক নতুন নোংরা খেলা - রেল জিহাদ।

আমেরিকায় জাতীয়তাবাদী ঝড়

নির্বাচনে ভোকাট্টা বামপন্থীদের জারিজুরি এখন প্রশ্নের মুখে

জয়ন্ত গুহ

দিনের আলোর মত এখন পরিষ্কার, ভারতীয় শেয়ার বাজারে অস্থিরতা তৈরি করা আসলে আমেরিকার বৃদ্ধ ও অতি-বিপ্লবী মার্ক্সিস্টদের ভারতীয় অর্থনীতিকে আক্রমণের ছক এবং তাতে

বাইডেন-কমলা হ্যারিসের প্রশাসনকে সামনে রেখে ওবামা-হিলারি ‘হাভার্ড লেকচার’ দেওয়া ছাড়া আসলে গত ৪ বছরে কি করেছে? কাদের স্বার্থে করেছে? কীসের স্বার্থে খুলে দেওয়া হয়েছিল দেশের বর্ডার? কাদের স্বার্থে বামপন্থীরা যুদ্ধে মদত দিচ্ছিল ইউক্রেনকে? কেন মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস আমেরিকার মধ্যবিত্ত-শ্রমিকদের? কেন এত চিন নির্ভরতা? নির্বাচনে এই সব প্রশ্ন তুলেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। উত্তর দিতে পারেনি সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন আমেরিকার বামপন্থীরা। ১ বিলিয়ন ডলার ডোনেশন সংগ্রহ করেও মুখ থুবড়ে পড়ে বাম-বিপ্লবী কমলা হ্যারিস। আপাতত কমলার মাথায় মিলিয়ন ডলারের দেনা। ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে আসতেই, জর্জ সোরোস এবং আমেরিকার বামপন্থী (পরাজিত)-দের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে? কে এই সোরোস? সোরোস যখন মোদীকে আক্রমণ করেছে, ভারতের রাজনীতিতে মাথা গলিয়েছে, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ বা সিএএ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, গৌতম আদানির সংস্থাকে বারবার আক্রমণ করেছে তখন কেন চুপ ছিল বাইডেন-কমলার প্রশাসন এবং পিছন থেকে ‘হোয়াইট হাউস’ নিয়ন্ত্রণ করা ওবামা-হিলারি?

প্রশ্ন উঠছে তীব্র মোদী বিরোধী ‘কুখ্যাত’ র‍্যাডিক্যাল মার্ক্সিস্ট আমেরিকার ধনকুবের জর্জ সোরোসের সঙ্গে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসের সম্পর্ক এবং সোরোসের সঙ্গে আমেরিকার ডেমোক্র্যাট পার্টির রহস্যময় সম্পর্ক নিয়ে। দিনের আলোর মত এখন পরিষ্কার, ভারতীয় শেয়ার বাজারে অস্থিরতা তৈরি করা আসলে আমেরিকার বৃদ্ধ-মাথামোটা-ধূর্ত অতি-বিপ্লবী মার্ক্সিস্টদের ভারতীয় অর্থনীতিকে আক্রমণের ছক এবং তাতে দাবার বোড়ে ‘নকল গান্ধী পরিবার’-এর রাহুল বাবা।

‘ভারত জোড়ো যাত্রা’-য় রাহুলের সঙ্গে সোরোসের ‘ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন’-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সলিল শেট্টি।

কিন্তু আমেরিকার নির্বাচনের সঙ্গে ভারতীয় শেয়ার বাজারে অস্থিরতা তৈরি করা বা আমেরিকার আদালতে আদানিকে ‘কাঠগড়ায়’ তোলার সম্পর্ক কি? আর সবচেয়ে বড় কথা, আমেরিকার নির্বাচনে তো জিতেছে রিপাবলিকান পার্টি এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর সঙ্গে তো ভারত, নরেন্দ্র মোদী এবং গৌতম আদানির সম্পর্ক বেশ ভাল। আর এইখানেই যত গণ্ডগোলের সূত্রপাত বলে ভারত-আমেরিকা বিশেষজ্ঞদের ধারণা। আমেরিকার নিউইয়র্ক আদালতে আদানির বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আনার আগে, ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে সমাজমাধ্যমে পরপর বেশ কয়েকটি পোস্ট করেন গৌতম আদানি এবং আমেরিকার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে (এনার্জি) ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন। ঠিক তার পরপরই আদানিকে ‘কাঠগড়ায়’ তোলে জো বাইডেনের আমেরিকা। হ্যাঁ, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও অফিসিয়ালি দায়িত্বভার নেবেন ২০ জানুয়ারি ২০২৫। তার আগে পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট কিন্তু বামপন্থী বাইডেনই। এবং বাইডেন বা ডেমোক্র্যাট পার্টি যতটুকু সময় ক্ষমতায় আছে ততক্ষণ খুব জোরালোভাবে থাকবে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের নামে বিতর্কিত ‘হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ’-এর লম্ফঝম্প এবং ওই সংস্থার প্রধান বিনিয়োগকারী সোরোস, আমেরিকায় বসবাসকারী অতি-বাম ধনকুবের জর্জ সোরোস। যিনি কুখ্যাত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় বিপুল পয়সার মাধ্যমে সেখানকার রাজনীতিক এবং মিডিয়াকে নিজের পকেটে পুরে ক্ষমতার দখল নেওয়া। তারপর সেই দেশকে লুঠেপুটে খাওয়া এবং নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা। কখনও সেটা ‘স্বাধীন তিব্বত’ আন্দোলন হতে পারে বা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ‘স্বাধীন ইউক্রেন’ আন্দোলন বা ‘আজাদ কাশ্মীর’ আন্দোলন বা

কংগ্রেসের ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’। নিজে আড়ালে থেকে এ ধরনের বদমাইশি তিনি করেন তাঁর ‘ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন’ এবং সেই সংস্থার ফান্ডিং-এ চলা অজস্র সামাজিক এবং মিডিয়া সংস্থার মাধ্যমে। সেটা কখনও হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ বা সিএনএন-এনবিসি মত আমেরিকান মিডিয়া সংস্থা বা ওসিসিআরপি-র মত স্বঘোষিত আন্তর্জাতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংস্থা।

কংগ্রেসের ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’-য় আমরা রাহুলকে একসঙ্গে হাঁটতে দেখেছি ‘ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন’-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সলিল শেট্টির সঙ্গে এবং ওসিসিআরপি-র ওয়েবসাইটে রাহুল গান্ধীর ছবি দিয়ে সোরোসের সংস্থা বলেছিল, ‘সোরোসের কথা কংগ্রেসের গলায় প্রতিধ্বনিত হয়’ বা ‘জর্জ সোরোসের ওসিসিআরপি রাহুল গান্ধীর প্রোমোশন হাউস (বিজ্ঞাপন)’’। গান্ধী পরিবার বা কংগ্রেস সোরোসের সংস্থা থেকে টাকা নিয়েছে কিনা আমরা জানিনা কিন্তু আমেরিকায় রিপাবলিকান পার্টির জর্জ বুশকে ক্ষমতাচ্যুত করে বারাক ওবামাকে ক্ষমতায় আনতে ২০০৩-০৪ সালে ডেমোক্র্যাট পার্টির ঘনিষ্ঠ ৫২৭টি আমেরিকান সংস্থাকে সোরোস দিয়েছিল ২৩,৫৮১,০০০ ডলার। যদিও সেবার জিতে যায় বুশ। কিন্তু ২০০৩-এ সোরোসের ফান্ডিং-এ (৩ মিলিয়ন ডলার) আমেরিকায় ‘সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেস’ নামে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্থা তৈরি হয়। সংস্থায় নিয়ে আসা হয় এক ঝাঁক ডেমোক্র্যাট (বামপন্থী) নেতা – বিল ক্লিনটন, বারাক ওবামা, হিলারি ক্লিন্টন, জো বাইডেন সহ আরও অনেককে। ২০০৯ জানুয়ারিতে ক্ষমতায় আসে ওবামা। ওই বছরেই ওবামার শাসনকালে সেবামূলক কাজের নামে সোরোস মোট ১৭৫ মিলিয়ন ডলার দান করে নিউইয়র্ক প্রদেশকে। যে নিউইয়র্ক প্রদেশের অ্যাটর্নি ব্রেয়ন পিস ‘কাঠগড়ায়’ তুলেছে ভারতের আদানিকে, তাঁর সঙ্গেও রয়েছে সোরোস যোগাযোগ। একাধিক মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সেনেটর চাক শ্যুমার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে ২০২১ সালে নিউইয়র্ক প্রদেশের অ্যাটর্নি হিসাবে ব্রেয়ন পিস-এর নাম প্রস্তাব করে। স্বাভাবিক অঙ্কেই বাইডেন সেই প্রস্তাবে চোখ বুজে সম্মতি দেয় কেননা সেনেটর চাক শ্যুমার সোরোসের পুত্র অ্যালেক্স সোরোসের বিশেষ বন্ধু এবং ‘সোরোস মতবাদ’-এর জোরালো সমর্থক। সেই ‘সোরোস মতবাদ’ যা কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের বিরোধিতা করেছিল, সিএএ-এর বিরোধিতা করেছিল, আদানিকে সামনে রেখে এই সেই সোরোস যে স্পর্ধা দেখিয়েছিল নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করার, বলেছিল ‘‘আদানি শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শেয়ার বাজারে যে জালিয়াতির (স্টক ম্যানিপুলেশন) অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং ভারতের সংসদে জবাবদিহি করতে হবে।’’

রাহুল গান্ধীর ছবি দিয়ে সোরোসের সংস্থার প্রচার।

অদ্ভুত হলেও সত্যি যে সোরোস যখন যা বলেছে সেটাই ভারতে এক সুরে বলেছে কংগ্রেস - তৃণমূল - এসপি-সিপিএম-এমকে সহ ইন্ডি জোট। অদৃশ্য কোনও সূতোর টানে আমেরিকায় বসে যেন সোরোস (সঙ্গে নীরব সমর্থন দেওয়া ডেমোক্র্যাটরা) ভারতে ইন্ডি জোটের ন্যারেটিভ তৈরি করে দিচ্ছে পার্লামেন্টে বা নির্বাচনে। আরও অদ্ভুত, বাংলাদেশের ইউনূস এবং বিএনপি যেমন ভারত-হিন্দু ও ট্রাম্প বিরোধী, সোরোসও একইভাবে হিন্দু-ভারত-মোদী ও ট্রাম্প বিরোধী! ইউনূস প্রবলভাবে বিল ক্লিনটন ঘনিষ্ঠ। ক্লিনটন আবার সোরোস ঘনিষ্ঠ। তা হলে বাংলাদেশে শেখ হাসিনাকে পদচ্যুত করে তীব্র হিন্দু নিগ্রহ কি ভারতকে চাপে রাখার প্লট? আদানিকে কাঠগড়ায় তোলার মধ্যে কি কোনও ভূ-রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে? সোরোস কি চেয়েছিল, জর্জ বুশের মত নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করে কংগ্রেসের রাহুলকে ক্ষমতায় বসাতে? একবার নয়, বহুবার বহুভাবে চেয়েছে মোদী সরকারকে বিপাকে ফেলতে। এবং প্রতি বছর অনুদানের নামে কোটি কোটি টাকা ভারতে খরচা করে মোদী-হিন্দু-ভারত এবং আরএসএস বিরোধী ন্যারেটিভ তৈরি করতে। কিন্তু কেন? কেন আন্তর্জাতিক তালিকায় ৪৮০ নম্বরে থাকা আমেরিকান শিল্পপতি সোরোসের (এবং সঙ্গে আমেরিকার ডিপ স্টেট) এত রাগ তালিকায় ২১ নম্বরে থাকা গৌতম আদানিকে নিয়ে? মোদী ঘনিষ্ঠ বলে? এটা যদি অভিযোগ হয় তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, ২০২১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত আমেরিকায় নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত সোরোস কেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী এবং দলের জন্য ১২৮ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছিল? আফগানিস্তানে আমেরিকার সেনা প্রত্যাহারের পিছনে কি অন্য কোনও গল্প ছিল? বাইডেন পুত্র হান্টার বিডেনের সঙ্গে ইউক্রেনের সম্পর্ক কি? ২০২৫ জানুয়ারির পর বাংলাদেশ এবং ইউনূসের কি হবে? জর্জ সোরোসকে কি তাড়িয়ে দেওয়া হবে আমেরিকা থেকে? আদানি-আম্বানিই কি হতে চলেছেন আগামীদিনে ভারত-আমেরিকা বানিজ্যের নয়নের মণি? উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে ২০ জানুয়ারি ২০২৫ অবধি। সেদিনই আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট পদে আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভার নেবেন ডোনাল্ড জন ট্রাম্প।

ছবিতে খবর

বিজেপি দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার কসবা বিধানসভায় সদস্যতা অভিযানে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

'সদস্যতা অভিযান ২০২৪'- কে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে বেহালা পশ্চিম বিধানসভার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সদস্যতা অভিযানে রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

শ্যামপুকুর বিধানসভার বি কে পাল অ্যাভিনিউয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বাগবাজার ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেল উত্তর কলকাতা জেলার উদ্যোগে বিশেষ সদস্যতা অভিযানে হকার ও অটো ড্রাইভার সদস্যকরণ।

রাজারহাট গোপালপুরে বিজেপি সদস্যতা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

রাজারহাট-নিউটাউন বিধানসভার ১২০নং বুথে প্রমোদগড়ে "মেগা সদস্যতা অভিযানে" রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনতে "মেগা সদস্যতা অভিযান" উপলক্ষ্যে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে বুথ সভাপতি পর্যন্ত সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বুথে বুথে গিয়ে সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।

ছবিতে খবর

মেজবিল ৫৫ তম রাসযাত্রা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
বিধায়ক দীপক বর্মণ।

আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার মন্ডল ১-এ বরাচকের তিলি পাড়াতে
সনাতনী হিন্দুদের মধ্যে খোল বিতরণ করলেন বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল।

ময়না বিধানসভার ঐতিহ্যবাহী ময়না রাসমেলায়
বিধায়ক অশোক দিন্দা।

তুফানগঞ্জের সুভাষপল্লী বারোয়ারী মহানামযজ্ঞ কমিটি আয়োজিত
মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠানে বিধায়িকা মালতী রাভা রায়।

স্বামী প্রদীপ্তানন্দ (কার্তিক মহারাজ)-এর সাথে বেলডাঙা
ভারত সেবাসংঘ আশ্রমে বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া।

পাল্লা "রাই রসরাজ সেবাশ্রম" আয়োজিত রাস
উৎসবে বিধায়ক স্বপন মজুমদার।

দাঙ্গা বিধ্বস্ত বেলডাঙায় অমানবিক হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বেলডাঙায় পৌছনোর পথে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেফতার করে মমতা ব্যানার্জির পুলিশ।

সদস্যতা অভিযান উপলক্ষ্যে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে বুথ সভাপতি পর্যন্ত সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বুথে বুথে সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে।

ছবিতে খবর

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার চাঁদপাড়া ৩নং মন্ডলের ১৫৯নং বুথে সদস্যতা অভিযানে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

জয়নগর সাংগঠনিক জেলার নিমতিতায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সদস্যতা অভিযানে রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলায় মহিলা মোর্চার সদস্যতা অভিযান কর্মসূচি।

বোলপুর বিধানসভায় সদস্যতা অভিযানে রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী শ্রীমতি ফাল্গুনী পাত্র।

আমতা বিধানসভার গাজীপুর পঞ্চায়েতে সদস্য সংগ্রহ অভিযান।

আরামবাগ বিধানসভার মন্ডল ৩-এর মলয়পুরের বালিয়াতে সদস্যতা অভিযান।

বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনতে "মেগা সদস্যতা অভিযান" উপলক্ষ্যে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে বুথ সভাপতি পর্যন্ত সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বুথে বুথে গিয়ে সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।

ট্রাম্পের বিপুল জয়ে আতঙ্কে ইউনূস

ইসকনকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা এখন অলীক স্বপ্ন

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৮ বছর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প জগন্নাথের রথ তৈরির জন্য ইসকন-কে মুফতে জায়গা দিয়েছিলেন আমেরিকায়। এবার আমেরিকায় ট্রাম্প ক্ষমতায় চলে আসার ফলে, বাংলাদেশে ইউনূস সরকার এবং কাঠমোল্লাদের ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দুরভিসন্ধি এখন অলীক কল্পনামাত্র।

হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ব্যাপক আক্রমণের ঘটনা ঘটতে থাকে। এমন অবস্থায় প্রতিবাদ জানাতে দিকে দিকে শুরু হয় বিক্ষোভ সমাবেশ। ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিপুল জনসমাগম হয়। সেই জনজোয়ার নজর কাড়ে গোটা বিশ্বের। এই দুই সমাবেশেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল ইসকন। এরপরে ইসকনের ওপর বাংলাদেশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে, এমন খবর রটে যায়। জল্পনার অবশ্য বিশেষ কিছু কারণও ছিল। বাংলাদেশে বর্তমানে ইউনূস সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে জামাত-বিএনপির এবং হেফাজতে-ইসলামের হাতে। সেই মৌলবাদীরা সম্প্রতি ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলে। চট্টগ্রামে বিপুল জনসমাগমের পরেই এক মৌলবাদী, সমাজমাধ্যমে ইসকন বিরোধী পোস্ট করে। সংস্থাকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। যার ফলে অশান্ত হয় চট্টগ্রাম। এই ঘটনায় ৫৮২ জনকে আটক করে পুলিশ। প্রশাসনের তরফ থেকেও বলা হয়, ধৃতরা প্রত্যেকেই ইসকনের সদস্য। অনেকে বলতে থাকেন, আসলে প্রশাসন অশান্তি ছড়ানোর জন্য মৌলবাদীদের বদলে ইসকনকে দায়ী করছে মূলত দুটি কারণে- প্রথমতঃ বাংলাদেশের প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে মৌলবাদীদের হাতে এবং দ্বিতীয়তঃ সে কারণেই ইসকনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে মৌলবাদীদের খুশি করতে চায় বাংলাদেশের প্রশাসন।

কৃষ্ণ ভক্ত তুলসী গ্যাবার্ড— ঘোষিত মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান

নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে একরোখা হিন্দু জোট

তার পরেই যেন খেলা ঘুরতে শুরু করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যখন তিনি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিলেন, তখনই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। তাই ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই উদ্বেগে রয়েছে বাংলাদেশের ইউনূস সরকার। এমন অবস্থায় ওয়াকিবহাল মনে করছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ইসকনের বিরুদ্ধে কোনওরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অন্তত পক্ষে আর নিতে পারবে না।

বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে, ট্রাম্পের আমলে আমেরিকার সরকার বাংলাদেশ সম্পর্কে কেমন অবস্থান নিতে চলেছে, তা বিদায়ী সরকারের বিদেশনীতিতেই পরিষ্কার। সেই দিশানির্দেশ দেখিয়ে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শতাধিক সাংবাদিকের স্বীকৃতি বাতিল নিয়ে, একপ্রকার ইউনূস সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। শুধু সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সওয়াল নয়, ইউনূস সরকারকে বিরোধীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে মার্কিন বিদেশ দফতর। গত ১০ নভেম্বর আওয়ামি লিগের রাজনৈতিক কর্মসূচির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং ধরপাকড়-হামলার প্রসঙ্গ তুলে আমেরিকার বিদেশ দফতরের মুখপাত্রের মন্তব্য— "আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং ভিন্নমত পোষণ করতে পারার অধিকারকে সমর্থন করি। আমেরিকা মনে করে, কোনও গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য এগুলি অপরিহার্য।"

ইউনূস আত্মবিশ্বাসী ছিলেন কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হবেন বিশ্লেষকরা

বাংলাদেশে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি ওলামা ঐক্য পরিষদের

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধনে এ দাবি জানায় সংগঠনটি

সৌজন্য 'ঢাকা ট্রিবিউন'

জানাচ্ছেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ইউনূসের সঙ্গে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অনেকের ধারণা, ইউনূসকে বাংলাদেশে ক্ষমতার মসনদে বসাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ডেমোক্র্যাটরা। ২০২৪ সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে ইউনূস আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস জিতবেন। ইউনূস ভেবেছিলেন, ডেমোক্র্যাট রাষ্ট্রপতির অধীনে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাকে সেক্ষেত্রে তাঁর সোনায় সোহাগা হবে। বাংলাদেশে ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর যে ধরনের নির্যাতন চলছে, সে নিয়ে মার্কিন প্রশাসন কোনও কথা বলবে না। একইসঙ্গে কট্টরপন্থী ইসলামিক মৌলবাদীদের সঙ্গে ইউনূসের যোগকেও উপেক্ষা করে চলবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই আশা ছিল কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হবেন। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প বিপুল ভোটে জয়ী হতেই সে আশা ভেঙে যায়।

বাংলাদেশে ধর্মীয়ভাবে হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনায় গত ৩১ অক্টোবরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে, এর প্রতিবাদ জানিয়ে পোস্ট করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের ওই পোস্টে ইউনূস ও তাঁর কট্টর মৌলবাদী ইসলামপন্থী বন্ধুরা খুবই অস্বস্তিতে পড়ে যান। নিজের পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, "হিন্দু খ্রিস্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে যে বর্বর অত্যাচার হচ্ছে বাংলাদেশে, তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। বাংলাদেশ বর্তমানে উপদ্রুত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।" কী বলছেন আওয়ামী লিগের নির্বাসিত নেতা? ট্রাম্পের এমন ট্যুইট বাণ ইউনূসকে হজম করতে হয়। তিনি তখনও আশায় মগ্ন ছিলেন যে কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়েছে।

ইউনূস সরকার আশঙ্কিত যে কোনও মুহূর্তে নতুন মার্কিন প্রশাসন, বাংলাদেশের হিন্দু সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় নিয়ে ফের সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। ইউনূস নিজেও জানেন, এক্ষেত্রে তাঁর ডেমোক্র্যাট বন্ধুরা কিছুই করতে পারবেন না। স্বরাজ্য পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, এক আওয়ামী লিগের নির্বাসিত নেতা দাবি করেছেন, "ডোনাল্ড ট্রাম্পের জমানায় ইউনূস ও তাঁর প্রশাসনকে কঠিন তদন্তের মুখোমুখি হতে হবে। কোনওভাবেই আর কট্টর ইসলামপন্থী মৌলবাদীদের প্রতি নরম হতে পারবে না ইউনূস।" আওয়ামী লিগের ওই নেতার আরও দাবি, "ইউনূস নিজেও জানেন যে ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা যদি হয় তবে সেখানে নজরদারি চালাতে থাকবে ট্রাম্প প্রশাসন এবং তিনি নিজেও মৌলবাদীদের খুশি করার মতো পদক্ষেপ করতে পারবেন না।"

হেফাজতে ইসলামের ইসকন বিরোধী সমাবেশে স্লোগান— একটা একটা ইসকন ধর, ধরে ধরে জবাই কর'

মার্কিন দেশে রয়েছেন প্রচুর ইসকন ভক্ত

প্রসঙ্গত অনেকেই বলছেন যে ইউনূস প্রশাসন ইসকনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসকনের প্রচুর প্রভাবশালী ভক্ত রয়েছেন। এই তালিকায় রয়েছেন শিল্পপতি থেকে বিভিন্ন পেশাদাররা, যাঁরা প্রত্যেকেই রিপাবলিকানদের ঘনিষ্ঠ। এমনকী, খোদ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইসকনের সুসম্পর্ক রয়েছে। আবার বেশ কিছু প্রভাবশালী ইসকন ভক্তের সঙ্গে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, "ট্রাম্পের সঙ্গে বহু পুরনো এবং দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ইসকনের। মার্কিন মুলুকে ইসকনের রথযাত্রার সূচনার নেপথ্যে বিরাট ভূমিকা ছিল ট্রাম্পের। ইসকনের রথযাত্রার অন্যতম বড় পৃষ্ঠপোষকও ট্রাম্প।

ট্রাম্প ও ইসকনের ইতিহাস

৪৮ বছর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প জগন্নাথের রথ তৈরির জন্য মুফতে জায়গা দিয়েছিলেন। ১৯৭৬ সাল। মার্কিন মুলুকে প্রথমবার রথযাত্রা উৎসবের উদ্যোগ চলছে। রথ কোথায় তৈরি করা হবে, তা নিয়ে ইসকনের কর্তারা যখন ধন্দে, তখনই প্রায় ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ট্রাম্প। ইসকনের কর্তারা তখন নিউইয়র্ক শহরের ধনী ব্যক্তিদের কাছে রথ বনানোর জন্য জায়গা চেয়ে অনুনয়-বিনয় করছেন। কেউ তাঁদের জায়গা দিচ্ছেন না। জায়গার খোঁজে তাঁরা যখন হন্যে হচ্ছেন, তখনই একদিন তাঁরা গেলেন ট্রাম্পের কাছে।

সব শুনে তাঁর সেক্রেটারি বললেন, ওঁর সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ জানাতে পারেন। তবে তাতে কাজ হবে না। ইসকনের কর্তারা ট্রাম্পের সেক্রেটারির হাতেই তাঁর জন্য নিয়ে যাওয়া মহাপ্রসাদ তুলে দিয়ে এসেছিলেন। এর কয়েক দিন পরেই এসেছিল ট্রাম্পের সই করা চিঠি। তার পরেই তাঁর একটি ফার্ম হাউসে শুরু হয় রথ তৈরির কাজ। মার্কিন মুলুকে সেই প্রথম গড়ায় রথের চাকা। ফলে, আমেরিকায় এখন ট্রাম্প ক্ষমতায় চলে আসার ফলে, বাংলাদেশে ইউনূস সরকারের ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দুরভিসন্ধি হয়ত সম্ভব হবে না।

হিন্দুবিরোধী ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে রংপুরে বিশাল সনাতনী সমাবেশ

মানসিকতা

বাংলাদেশের উভয় সংকটের কারন

নারায়ণ চক্রবর্তী

যখনই বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে শাসক দলের পরিবর্তন হয়েছে, লক্ষ্যনীয় হল, সব ক্ষেত্রেই যে দল ক্ষমতায় এসেছে তারা আগের ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ভারতের 'দালালি' করার ফাটা রেকর্ড বাজিয়েছে। এই দু দেশের রাজনীতির মূল সুর হচ্ছে ভারত বিরোধিতা যা শুরু হয়েছে দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকা হিন্দু বিরোধিতার সূত্র ধরে।

অন্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গে সামাজিক সহাবস্থান ইসলামীদের পক্ষে সম্ভব নয় কারন ইসলাম একটি পৃথক জাতিসত্তা - এই যুক্তিতে মৌলবাদের নেতা মহম্মদ আলী জিন্না ভারতভাগের যে দাবী করেন, তা মেনে নেয় বৃটিশ শাসক এবং অবশ্যই ক্ষমতার স্বাদের লোভে কংগ্রেস অর্থাৎ গান্ধী-নেহরু জুটি। ঐ সময়ে স্বাধীন ভুখন্ড দুটি ভাগে বিভক্ত করে যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল, তার শুরু থেকেই 'রাষ্ট্রধর্ম' হল ইসলাম।

এই ইসলামী জনগণের মধ্যে মুষ্ঠিমেয় ছিল শিক্ষিত মানুষ। অধিকাংশ অশিক্ষিত এবং নিম্নবিত্ত। যেহেতু মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম, সেহেতু এদের মধ্যে রেজিন্টেশানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা বোধ জাগানো সহজ ছিল। এই কাজে মুসলিম লীগ ব্যবহার করে তাদের মসজিদ ও মাদ্রাসার মৌলানা-মৌলভীদের। মসজিদ থেকে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে এরা 'বিধর্মী'দের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, তাদের মহিলাদের (মালাউন) নিজেদের যৌণদাসী বানানো এবং সর্বোপরি তাদের হত্যাকে আল্লার আদেশ বলে প্রচার করে মৃত্যুর পর এইসব পূণ্য কর্মের জন্য জান্নাতে ৭২ সুন্দরী হুরী ভোগের লোভ দেখিয়ে এক অদ্ভুত ঘৃণ্য মানসিকতার বিকারগ্রস্ত জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করে। ফলে, দুই পাকিস্তান খন্ডের মানসিকতায় অমুসলিম, বিশেষত হিন্দুদের প্রশ্নে একই রকম অসহিষ্ণুতার প্রকাশ দেখা গেল।

তারপর সময়ের সাথে যখন ইসলামীদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার আলো ঢুকলো তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ইসলামীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় দুই ইসলামী খন্ডেই অল্প কিছু মানুষ শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সহাবস্থানের মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক সহায়তায় দেশের উন্নয়ণকে গুরুত্ব দিতে শুরু করল। কিন্তু দেশের বৃহৎ অংশের মধ্যে হিন্দু বিরোধীতার সুর তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। সেই সঙ্গে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা বারবার সামনে আসতে লাগল। মসজিদ এবং মাদ্রাসা থেকে যে ঘৃণার বাণী ছড়ানো হল তার প্রভাবে এই দুইখন্ডের মানুষ বারবার ভারত আক্রমণের মধ্যে দিয়ে তাদের মানসিক ক্রোধ ও ঘৃণার নিবৃত্তির উপায় খুঁজতে লাগল।

১৯৬৫-র পর ১৯৭১ এবং ১৯৯৯এ তিনটি যুদ্ধে ভারতের কাছে বেত্রাহত কুকুরের মত মার খেয়েও পাকিস্তানের শিক্ষা হল না। ইতিমধ্যে তারা পূর্ব খন্ডের সঙ্গে বৈমাতৃসূলভ আচরণ করায় সেখানে মুজিবুর রহমনের নেতৃত্বে তারা ভারতের সহায়তায় পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা পেয়ে

বাংলাদেশের জন্ম হল। তাকে যে সব দেশ প্রথমে স্বীকৃতি দিয়েছিল তার অন্যতম হল ভারত ও রাশিয়া। আমেরিকা সে সময় পাকিস্তানের সমর্থনে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর কথা বলেও আর যুদ্ধে নামার ধৃষ্টতা দেখায়নি। তারপর থেকে পাকিস্তান ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলি ভারতের বিরুদ্ধে জঙ্গী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারতে যে নাশকতা চালানো শুরু করল, সেখানে বাংলাদেশের দিক থেকেও তাদের সহমর্মী সহযোগীরা, রাজাকার, এবং বিভিন্ন জেহাদি গোষ্ঠী, একই পদ্ধতিতে ভারতে অস্থিরতা চালাতে লাগল।

যেটা উল্লেখ করা দরকার, তা হল, বাংলাদেশের জন্মের পরেও সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু তথা ভারতের বিরুদ্ধাচরন করার প্রবনতা বন্ধ হয়নি। তাদের মসজিদ-মাদ্রাসায় এই শিক্ষা দিয়ে জেনারেশানের পর জেনারেশান এরা অন্ধ ভারত বিরোধিতায় ইসলামীদের নিয়োজিত করেছে। যেহেতু পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ, দু দেশেই ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো বর্তমান, দু দেশের রাজনীতিতে সে কারনেই সংখ্যাধিক্য মানুষের মানসিকতাকে সম্মান জানিয়ে দু দেশেই সরকার তৈরী হয়। তারা মুখে ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে ভারত তথা হিন্দু বিরোধী সেন্টিমেন্টকে জল সিঞ্চন করতে বাধ্য থাকে ভোটের রাজনীতির বাধ্যবাধকতায়। যখনই দু দেশে শাসক দলের পরিবর্তন হয়েছে, লক্ষ্যনীয় হল, সব ক্ষেত্রেই যে দল ক্ষমতায় এসেছে তারা আগের ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ভারতের 'দালালি' করার ফাটা রেকর্ড বাজিয়েছে। এই দু দেশের রাজনীতির মূল সুর হচ্ছে ভারত বিরোধিতা যা শুরু হয়েছে দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকা হিন্দু বিরোধিতার সূত্র ধরে।

এবার আসি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পালাবদলের যাত্রা পালায়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় আগের প্রায় সব পালা বদলের মত এবারেও গায়ের জোর ও ভারত তথা হিন্দু বিরোধিতায় ক্ষমতাসীন দলকে "ভারতের দালাল" বানিয়ে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমান কুটনীতির প্রেক্ষিতে বহু ব্যবহারে দীর্ণ ধর্মীয় হিংসা প্রসূত ঘৃণা এবং লোভ যে মধ্যযুগীয় বর্বরতার বহিঃপ্রকাশ এই দুই রাষ্ট্রের পালা বদলে দেখেছে, তাতে বিশ্বের দরবারে এদের সম্মান ধুলিস্যাৎ করেছে। কিন্তু ঐ - "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী"। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে ভারতের থেকে অর্থ সাহায্য এবং পরিকাঠামো উন্নয়ণ এবং আবশ্যিক পন্যের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ভারতকে প্রাধান্য দিলেন, তখন বাংলাদেশের মানুষের এই ধর্মীয় ঘৃণার সেন্টিমেন্টকে সরকারের বিরুদ্ধে চাগিয়ে তোলা হল। এ কাজ আটকানোর ক্ষমতা হাসিনা সরকারের ছিল না কারন তারা পূর্ববর্তী সরকারের মতই এই রাজাকার-পাকিস্তানপন্থী জেহাদীদের নেট ওয়ার্ক নষ্ট না করে তাতে জল দিয়ে মহীরুহ বানিয়েছে শুধুমাত্র ভোটে ফায়দা তোলার আশায়।

যদিও হাসিনা সরকারের আমলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে ধরে তাদের দেশের জিডিপির বৃদ্ধির হার লক্ষ্যণীয়। হাসিনা চেয়েছিলেন, শুধু ভারত নয়, চিনের থেকেও তারা সাহায্য নেবে। তা সত্বেও তিনি যখন দেখলেন, চিন উপমহাদেশের অন্য দেশগুলির মত বাংলাদেশকেও ঋণ ফাঁদে জড়াতে চাইছে, তখন তাদের সঙ্গে সম্পর্কে শীতলতা দেখালেন।

এদিকে ভারতের গত নির্বাচনের সময় থেকেই দায়িত্বজ্ঞানহীন অর্বাচীন কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কাজকর্ম করতে লাগলেন শুধুমাত্র শাসকের গদির লোভে। ভারতের ক্রমবর্ধমান সার্বিক উন্নতি আমেরিকার ডেমোক্র্যাটদের চক্ষুশূল হচ্ছিল। সেইসঙ্গে ১৯৭১-এ বাংলাদেশ ইস্যুতে তাদের কুটনৈতিক পরাজয় তারা কখনো মানতে পারেনি। পরন্তু ভারত মহাসাগরে চিন ও ভারতের আধিপত্য এই মহাদেশে আমেরিকার আধিপত্য বিস্তারের প্রধান অন্তরায় হওয়ায় বাংলাদেশের উপর অখুশী চিনের সঙ্গে আমেরিকা একযোগে বাংলাদেশের অস্থিরতায় পূর্ণ মদত দিল। সাম্প্রতিক মার্কিন নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত র‍্যাডিক্যাল মার্ক্সিস্ট কমলা হ্যারিসের পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা এবং কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের পরিপন্থী মত পোষণ করার কারণে কমলা হ্যারিস-জো বাইডেনের আমেরিকা বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিরতায় বড় রাজনৈতিক জুয়া খেলতে নামল। ঘটনা পরম্পরা সে দিকেই ইঙ্গিত করে।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ভারতের বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ প্রশ্নে কূটনৈতিক ব্যর্থতা ছিল। তার কারণ অনুসন্ধানে যা উঠে আসছে তা হল, দেশের বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধীর দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ এবং কথাবার্তা। এমনকি তিনি সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ভারতে জাতপাতের ভিত্তিতে

সংরক্ষণ ব্যবস্থার। অথচ, তিনি কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব তাঁর পরিবারের মধ্যে রেখে দেওয়ার বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন না। আবার তিনি দাবী তোলেন, শিখদের ভারতে ধর্মাচরণের পরিবেশ নেই! এমন স্ববিরোধী, ইতিহাস বিস্মৃত নেতৃত্বের দুর্বলতাই বারবার কংগ্রেসকে জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাকফুটে ফেলে দিচ্ছে। তিনি জানেন না, তাঁর ঠাকুরমার প্রধানমন্ত্রীত্বে স্বর্ণমন্দিরের সেনা অভিযান এবং তাঁর বাবার প্রধানমন্ত্রীত্বের শুরুতেই দিল্লীর কংগ্রেস প্রযোজিত শিখ নিধন প্রক্রিয়া! সর্বদা দেশের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে স্বল্পশিক্ষিত গান্ধী পরিবার দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করতে করতে এখন বিদেশের কাছে পর্যন্ত দেশের বদনাম করা শুরু করেছে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীত্বের গদির লোভে। এই গদিটিকে গান্ধী পরিবার তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করে। এ কারনে দেশের সম্মান ও রাজনৈতিক নেতাদের ইজ্জত বারবার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের সংরক্ষণ বিরোধী জামাতি ছাত্র আন্দোলনকে হাতিয়ার করে যখন সংরক্ষণ দেশের উচ্চতম আদালতের রায়ে উঠে গেল, তখনো আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নামে সরকারি সম্পত্তি ভাঙ্গচুর এবং শাসক দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ক্রমশ ধ্বংসাত্মক করার গতি প্রকৃতিই কিন্তু প্রমাণ করে যে এর পেছনে শক্তিশালী গোষ্ঠীর হাত আছে। পরবর্তীতে হাসিনাকে তড়িঘড়ি দেশত্যাগে বাধ্য করিয়ে যে অন্তর্বর্তী পরামর্শদাতার হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেওয়া হল তার গঠন লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই আন্দোলন করেছে বিএনপির সঙ্গে মিলে প্রাক্তন রাজাকার, পাকিস্তানপন্থী হিন্দু বিদ্বেষী জেহাদি শক্তি। তাদের মদতকারীদের মুখোশ খসে গেল যখন এই 'উপদেষ্টা'দের প্রধান, আমেরিকায় বসবাসকারী মহম্মদ ইউনূসকে দায়িত্ব দিয়ে ভারতকে যুদ্ধের হুমকি দিতে শোনা গেল! তিনি বললেন, বাংলাদেশের কথা মত না চললে তিনি ভারতের 'চিকেন নেক' কেটে 'seven sisters' অর্থাৎ ভারতের উত্তর পূর্বের সাতটি রাজ্যকে দখল করে নেবেন। তারপর থেকে বাংলাদেশের এলি-বেলি-তেলি অনেকেই এই হুমকি দিয়ে চলেছে। এরা সকলেই রাজনীতিতে অপরিণামদর্শী।

এখনকার বাংলাদেশের থেকে অনেক শক্তিশালী পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানে জেনারেল নিয়াজীর নেতৃত্বে থাকা সমগ্র পাক সৈন্যকে কোন শর্ত ছাড়া আত্মসমর্পন করাতে ভারতীয় সেনার সময় লেগেছিল মাত্র ১৪ ঘন্টা। এখন কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী অনেক বেশী শক্তিশালী। সুতরাং কোন গাধাও এমন দুঃসাহস দেখাবে না। বোঝাই যাচ্ছে, এর পেছনে বিদেশী শক্তির উস্কানি আছে। এই ইউনূসকে ভারতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে আমেরিকা এবং চিন হয়ত আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে পারে। তবে, ভারতের বিরুদ্ধে এমনকি খড়কুটো পেলেও দেউলিয়া হতে বসা পাকিস্তান তা আঁকড়ে ধরবে। এক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। ইউনূসের রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা বাংলাদেশের সকল মানুষকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্যে ফেলেছে। সম্প্রতি ইউনূস রাষ্ট্রসঙ্ঘে বাংলাদেশের প্রধান হিসেবে বক্তৃতা দেবার সময় ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। রাশিয়া দাবী করেছে, এই ইউনূস কে? রাষ্ট্রসংঘের রেকর্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান হলেন শেখ হাসিনা। তিনি যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছেন, সেই পদত্যাগের ডকুমেন্ট ইউনূস দেখাক। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কিছু মানুষ শুধু ঘৃণার রাজনীতি করে আন্তর্জাতিকস্তরে দাপাদাপি করবে - সেটা রাশিয়া কেন, ইউনূসের মদতদাতা আমেরিকা এবং চিনও তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ বিপদ এড়াতে মেনে নেবে না।

এদিকে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প বিপুল ভোটে জেতার পর বিপাকে পড়েছে ইউনূস। এটা এখন পরিষ্কার যে ট্রাম্পের আমেরিকা কোনও স্বীকৃতি দেবেনা নির্বোধ ইউনূস এবং বাংলাদেশের ইসলামি মৌলবাদকে। বিপদে পড়তে চলেছে জামাতি সমর্থনে থাকা বিএনপিও। বিএনপির খালেদা জিয়াকে জোর করে প্রধানমন্ত্রী বানানোর চেষ্টায় তাঁর ছেলে তারেখ রহমান জিয়া তাঁর পিতৃদেবের বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সময়ের ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছেন। এর মুখে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের বাণী হাস্যকর। বাংলাদেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন তো চুলোয় গেছে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণও লাটে উঠেছে। আদানি ইলেকট্রিকের এত টাকা বাকী যে তাদের ইচ্ছেয় যে কোন সময় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ শূণ্য হয়ে যাবে। যারা দয়া ভিক্ষার উপর নির্ভরশীল, তারা হাত পায়ের গুলো দেখিয়ে রাস্তায় মাস্তানি করতে নামলে যা হয়। এদিকে ভারত থেকে খাবার দাবার না এলে এবং ভারতের অভ্যন্তর দিয়ে বাংলাদেশের (যা বাংলাদেশ চাইছে) নেপাল, ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য এবং জলবিদ্যুত পরিবহনের পোল বসানো পর্যন্ত বিশ বাও জলে। একটি প্রবাদ আছে, "beggars should not be choosers"। এই আপ্ত বাক্য ভুলে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার হিংসা ছড়ানো বাংলাদেশের দুরবস্থার সবে শুরু।

দেশে উপনির্বাচনের ফল

আসন	ছিল	পেল	আসন	ছিল	পেল
ধলাই	বিজেপি	বিজেপি	দৌসা	কংগ্রেস	কংগ্রেস
সিদলি	ইউপিপিএল	ইউপিপিএল	দেওলি-উনিয়াড়া	কংগ্রেস	বিজেপি
বঙ্গাইগাঁও	অগপ	অগপ	খিনসোয়ার	আরএলপি	বিজেপি
বেহালি	বিজেপি	বিজেপি	চোরাসি	বিএপি	বিএপি
সামাগুড়ি	কংগ্রেস	বিজেপি	রামগড়	কংগ্রেস	বিজেপি
তারারি	সিপিআইএমএল	বিজেপি	সালুম্বের	বিজেপি	বিজেপি
রামগড়	আরজেডি	বিজেপি	সোরেং-চাকুং	এসকেএম	এসকেএম
ইমামগঞ্জ	হাম	হাম	নামচি-সিংহিথাং	এসকেএম	এসকেএম
বেলাগঞ্জ	আরজেডি	জেডিইউ	কারহাল	এসপি	এসপি
রায়পুর সিটি দক্ষিণ	বিজেপি	বিজেপি	সিশামাও	এসপি	এসপি
ভাভ	কংগ্রেস	বিজেপি	ফুলপুর	বিজেপি	বিজেপি
চন্নাপটনা	জেডিএস	কংগ্রেস	কুন্দরকি	এসপি	বিজেপি
সান্দুর	কংগ্রেস	কংগ্রেস	কাটেহারি	এসপি	বিজেপি
শিগগাঁও	বিজেপি	কংগ্রেস	গাজিয়াবাদ	বিজেপি	বিজেপি
পালাক্কাড়	কংগ্রেস	কংগ্রেস	খৈর	বিজেপি	বিজেপি
চেলাক্কারা	সিপিএম	সিপিএম	মাঝাওয়ান	নিষাদ পার্টি	বিজেপি
বুধনি	বিজেপি	বিজেপি	মীরাপুর	আরএলডি	আরএলডি
বিজয়পুর	কংগ্রেস	কংগ্রেস	কেদারনাথ	বিজেপি	বিজেপি
গামবেগরে	কংগ্রেস	এনপিপি	সিতাই	তৃণমূল	তৃণমূল
বার্নালা	আপ	কংগ্রেস	মাদারিহাট	বিজেপি	তৃণমূল
ডেরা বাবা নায়ক	কংগ্রেস	আপ	নৈহাটি	তৃণমূল	তৃণমূল
চব্বেওয়াল	কংগ্রেস	আপ	হাড়োয়া	তৃণমূল	তৃণমূল
গিডারবাহা	কংগ্রেস	আপ	মেদিনীপুর	তৃণমূল	তৃণমূল
ঝুনঝুনু	কংগ্রেস	বিজেপি	তালড্যাংরা	তৃণমূল	তৃণমূল

/BJP4Bengal bjpbengal.org

সংবিধানে কি অবহেলিত
ভারতের জাতীয় সত্তা?

সজল কুমার বিশ্বাস

সংবিধানের Preamble-এ Nation শব্দটাকে একেবারে শেষ লাইনের একটা কোণে স্থান দেওয়া হয়েছে। এটা একজন দেশপ্রেমী মানুষের কাছে কতটা অসম্মানের সেটা ভারতবাসী বুঝতে পারবে সেই দিন যেদিন মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষার কুপ্রভাবের বাইরে বেরিয়ে এসে ভারতের মাটির কাছ থেকে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করার সামর্থ তারা অর্জন করে উঠতে পারবে।

সংবিধান হল রাষ্ট্রের তরফে নাগরিকদের প্রতি তার সেবার আশ্বাসবাণীর সংকলন কিন্তু সংবিধান যদি শুধু একটা নীতিমালা বা আইনের বই হয়ে ওঠে তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ে এবং রাষ্ট্রের গঠনাত্মক ভাবনাগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে না। দেশের মাটির ভাবনা বা সেন্টিমেন্ট যদি একটা রাষ্ট্রের সংবিধানে প্রাধান্য না পায় তাহলে সেটা পণ্ডিতদের তর্ক সাহিত্য হয়ে ওঠে তখন সাধারণ মানুষ সেই বই পড়ার কোন অনুপ্রেরণা পায় না।

সংবিধানের Preamble টা হোল রাষ্ট্রের তরফে একটা শক্তিশালী ডিজাইন করা advertisement এর মতো বিষয়, ছাত্রছাত্রীরা বার বার সংবিধানের ওই একটা পাতাতেই তাদের দৃষ্টি সীমিত রাখে তার ফলে ওই Preamble-এর প্রতিটি শব্দ কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে বাধ্য। দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ হল ভারতীয় দর্শনের অবিচ্ছিন্ন মৌলিক ধারণা কিন্তু সংবিধান পাঠক সংবিধানের preamble পড়তে গিয়ে সেখানে তারা দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদের কোন ইঙ্গিতই পায়না। একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধানটা নেশন-এর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত থাকে কিন্তু সংবিধান পড়তে গিয়ে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা Nation শব্দটাকে Preamble এর সম্মানজনক জায়গায় কখনোই খুঁজে পায় না। এইভাবে Nation শব্দহীন Preamble টা বার বার দেখতে দেখতে দেশের নাগরিকদের অবচেতনে নিজেদের দেশ বলতে একটা কবন্ধ চিত্র তৈরী হয় যার মাথাটা নেই কিন্তু হাত পা আছে।

Preamble এ নাগরিকের জন্যে আছে নানা অধিকারের আশ্বাস যেমন JUSTICE, LIBERTY, EQUALITY, FRATAERNITY এমন কতো কিছু কিন্তু এই আশ্বাসগুলো যে Nation-এর শাসনতান্ত্রিক নীতি সেই Nation টাকেই সংবিধানে স্বীকার করা হল না। নয়শত বছর পরে যখন দেশে স্বাধীনতা এলো তখন আমাদের দেশের জননেতারা দেশের সীমা সুরক্ষা এবং মানুষের কল্যাণে উদাসীন হয়ে তাদের মস্তিস্ক উদ্ভাবিত অহিংসা নীতি আর গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার নীতিগুলোকে সামনে রেখে পৃথিবীতে নিজেদের মহিমা প্রচার করার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যে দেশটা তখনও স্বাধীন হয় নি তার নাগরিকের মধ্যে সম্ভাব্য জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অঙ্কুরে দমন করার এক ভয়ানক প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছিল সে প্রচেষ্টার অভিজ্ঞান হিসাবে সংবিধানের প্রস্তাবনাকে আজও চিহ্নিত করা যায়। পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী ধারণার সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবাদী ধারণার কোন মিল নেই, ঠিক যেমন আব্রাহামিক রিলিজিয়ন এবং ভারতীয় দর্শন ভিত্তিক ধর্ম ধারণায় মিলের চেয়ে অমিল বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে।

ভারতবর্ষ একদিন নব্বইটা দর্শনের জন্ম দিয়েছিল যাদের আলাদা আলাদা নামকরণও হয়তো করা হয়েছিল কিন্তু এতো দর্শনের মাতৃভূমি এই প্রাচীন দেশ তিন হাজার বছরের মধ্যে নিজেদের ধর্মের একটা নামকরণ করে উঠতে পারেনি তার কারণ এই মাটিতে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা হল উপলব্ধিপ্রধান আধ্যাত্মবাদ যেখানে কোন ঈশ্বরের বাণীকে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপরে ঠাঁই দেওয়া হয় না।

ভারতের দর্শনে মানুষের বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই বিশ্বাসের ভূমি যুক্তি এবং প্রশ্নের কঠিন ভূমিতে নিবদ্ধ। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে মনে করে তাই সেখানে আগ্রাসী চিন্তার কোন জায়গা নেই সেটা স্বামীজি আমেরিকায় গিয়ে প্রচার করে এসেছেন। জাতীয়তাবাদের কথা বলতে গিয়ে ধর্মের কথা বলছি এই কারণে যে ভারতের মাটিতে ধর্ম, জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, জন্মভূমি

এবং মাতৃভূমি ইত্যাদি শব্দগুলো সমার্থক। জন্মভূমির উপর মাতৃভাবটা এসেছে রামায়ণ থেকে যেখানে ভরদ্বাজ মুনি রামের উদ্দ্যেশ্য বলছেন -

মিত্রাণি ধন ধান্যানি প্রজানাং সম্মতানিব।
জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।।

যার অর্থঃ "মিত্র, ধন এবং ধান্যকে পৃথিবীতে সম্মানিত করা হয়। (কিন্তু) জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেয়।"

অন্য আর একটি জায়গায় দেখছি বক্তব্যের রূপটা একটু আলাদা সেখানে রাম লক্ষ্মণকে বলছেন -

অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে লক্ষ্মণ রোচতে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।।

যার অর্থঃ "হে লক্ষ্মণ, এমনকি এই স্বর্ণময় লঙ্কাও আমাকে আকৃষ্ট করে না। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেয়।"

তাদের বিশিষ্ট অবদান। ভারতের মানুষের কাছে দেশপ্রেম হোল তার মাতৃভূমির মৃত্তিকাময় কুটিরের ভাবময় প্রদীপের সলতে যা জাতীয়তাবাদী ভাবনার আগুনের ছোঁয়ায় পৃথিবীর একমাত্র টিকে থাকা প্রাচীনতম সভ্যতার আলো বিচ্ছুরিত করতে পারে যে আলোর সম্মোহিনী প্রভাব সাগর পার করে ওপারের মানুষের হৃদয়কে ভারতের মাটিতে আকর্ষণ করে কিন্তু ভারতকে অস্ত্র হাতে সাগরপারের দেশ বিজয়ে অনুপ্রাণিত করে না।

দেশপ্রেম বর্জিত ভারতবাসী আজ আন্তর্জাতিক ভাবনার ছুতোয় দেশের মানুষের পয়সায় শিক্ষিত হয়ে একবার কালাপানি পার করতে পারলে আর এদেশে ফেরে না। আমদের পিচাইরা শুধু গুগলের সম্পদ নয় তারা প্রতিটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের মেধা সম্পদ কিন্তু যারা এখনও কালাপানি পার করতে পারে নি তারা আফশোষ করেন জননেতারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ধ্যেয়ানে বসে ভারতীয় মেধার দেশত্যাগের ঘটনাগুলিকে গুরুত্ব দেবার কথা ভাবতে পারেন নি কারণ তাদের আন্তর্জাতিক ভাবনায় দেশ বিদেশ বলে তো কিছু হয় না।

ভারতে একজন জননেতা খুঁজে পাওয়া যাবে কি না জানিনা যারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের জন্যে দেশের বাইরে পাঠাননি। জন নেতাদের মধ্যে এই বিদেশপ্রিয় মানসিকতা প্রমাণ করে তারা যে ভারত গঠন করেছেন সেখানে শিক্ষার মানকে তারা তাদের অপদার্থতার কারণে বিশ্বমানে উন্নীত করতে সচেষ্ট হন নি, না হলে বিশ্বে সর্বপ্রথম ইউনিভার্সিটি এডুকেশন শুরু করার একমাত্র যোগ্যতাধারী এই ভারতবর্ষে শিক্ষার মান আজ সকলের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে ওঠার কথা নয়।

সংবিধানে Nation শব্দটা বাদ দেওয়ার

ভারতবর্ষ একদিন নববইটা দর্শনের জন্ম দিয়েছিল যাদের আলাদা আলাদা নামকরণও হয়তো করা হয়েছিল কিন্তু এতো দর্শনের মাতৃভূমি এই প্রাচীন দেশ তিন হাজার বছরের মধ্যে নিজেদের ধর্মের একটা নামকরণ করে উঠতে পারেনি তার কারণ এই মাটিতে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা হল উপলব্ধিপ্রধান আধ্যাত্মবাদ যেখানে কোন ঈশ্বরের বাণীকে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপরে ঠাঁই দেওয়া হয় না।

এই রামায়ণ মহাকাব্যে অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা দেশকে মাতৃভূমি বলতে শিখেছি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মাতৃভূমি ধারণার ব্যাখ্যায় বলেছিলেন যে দেশকে তিনি জীবন্ত মাতৃরূপেই দেখতে পান। জার্মানীর ক্ষেত্রে তাদের জাতীয়তাবাদী ধারণা তাদের মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধায় নিহিত নয় বরং তাদের আত্মাভিমানের উৎসে নিবদ্ধ। জার্মানির আত্মাভিমানের উৎসগুলো ছিল তাদের দেশের অর্থনীতি, গায়ের চামড়ার রঙ, বিজ্ঞান এবং জড়বাদী জ্ঞানের এলাকায় যে কেন তারা তাদের প্রতিবেশীর মতো বিদেশে গিয়ে থিতু হতে পারেন নি। ওই পালাতে না পারা মানুষগুলো তাদের সন্তানদের সর্বদা মনে করিয়ে দেন যে বাঁচতে হোলে তাকে বিদেশেই যেতে হবে সেখানে মিলবে জীবনের ত্রিবিধ সম্পদ - সম্মান, অর্থ এবং সুরক্ষা। যে দেশপ্রেম ইজরায়েল সরকারকে পারলো বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা তার মেধাবী সন্তানদের দেশে ফিরিয়ে এনে দেশকে শক্তিশালী করতে কিন্তু প্রায় একই সময়ে স্বাধীনতা পেয়ে আমাদের ঘটনাটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার মত একটি ঘটনা মাত্র কিন্তু দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং দেশপ্রেম দমনের নানা কৌশল ভারত স্বাধীন হবার আগে থেকেই কার্যকরী ছিল এবং এখন স্বাধীনত্তর ভারতেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

স্বাধীনতার পরে দেশের সংবিধানের preamble-এ অনেক কিছু শব্দ ঢোকানো হয়েছে কিন্তু Natlon শব্দটা আজও ব্রাত্য হয়ে আছে। সংবিধানের PREAMBLE এ

Nation শব্দের উপস্থিতি ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোকে সমর্থন জুগিয়ে ভারতের মাটিতে বেড়ে ওঠা রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলোর সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারতো এবং আজ ভারতের মাটি ওই শক্তিগুলোর অবাধ ক্রীড়াক্ষেত্র হয়ে ওঠার সুযোগ পেত না। সংবিধানে ব্যবহৃত India শব্দটা দিয়ে আজ যে ভৌগলিক ভূমিক্ষণ্ডকে বোঝানো হয় সেখানে কিছু পর্যটকমনস্ক মানুষের হাতে ওই ভূমিখন্ডটা একটা বড় রেস্টুরেন্টে হিসাবে গণ্য হয়ে উঠেছে, যেখানে বসে তারা সংবিধানের উদার সংকল্প সূত্রে বাঁধা "Liberty of thought, expression, belief, faith and worship" ইত্যাদি অধিকারগুলোকে তাদের উদ্যেশ্য পূরণের স্বার্থে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারত তীর্থ' কবিতায় স্বপ্ন দেখেছিলেন আর্য অনার্য দ্রাবিড়, "চীন-শক-হুন-দল পাঠান-মোগল" ইংরেজ খৃষ্টান সবাই "এক দেহে" লীন হয়ে গিয়েছে কিন্তু তিনি তাঁর ওই কবিতায় এই "এক দেহ" শব্দের পরিবর্তে "এক জাতি" শব্দবন্ধের প্রয়োগ করে উঠতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতায় Nation ভাবনাটা কবিতাটার প্রতিটা চরণেই উকি দিয়ে গেছে কিন্তু তার প্রকাশ সম্ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথও দমন করেছেন কিন্তু কেউ প্রশ্ন করে না কেন জাতীয়তাবাদ আর দেশপ্রেমের নাইটিংগেলরা হঠাৎ জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের বিষয়ে রুদ্ধবাক আচরণ করতে শুরু করলেন। আজ ভারতের মাটিতে বসে রবীন্দ্রনাথের "ভারত তীর্থ" কবিতার উদার দর্শনকে সম্মান দিয়ে তাঁর মতো করে ভারতবর্ষকে যদি আমার "পূণ্য তীর্থ" বলে মনে করি এবং এই দেশের বাতাসে তাঁর মতো করেই "বিরামবিহীন মহা ওংকারধ্বনি" শুনতে চাই এবং একই আবেগে আমাদের হৃদয়তন্ত্রে "একের মন্ত্র" কে শুনতে চেয়ে আগ্রহ প্রকাশ করি তাহলে কি সংবিধান আমার সেই অধিকারকে সমর্থন দেবে? এই বিশেষ কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ যে "মার অভিষেকের" স্বপ্ন দেখেছেন যিনি অবশ্যই দেশমাতৃকা।"মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা"

কবিতাটির এই অংশ পড়লে বুঝতে পারি ভারতের সংবিধানে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চেতনায় মাতৃরূপে পুজিতা দেশের মাতৃভূমি সত্তাটাকে স্বীকার করার দরকার ছিল শুধু Integrity of Nation তত্ব দিয়ে ভারত একটাই জাতি এই সত্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না। দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোকে অস্বীকার করার ফলে এক জাতি ধারণার বিপ্রতীপে ভারতের মাটিতে বিভেদকামী শক্তিগুলো তাদের নখ দাঁত বের করে ফেলল আর তা ঠেকাতে রাষ্ট্রকে নিজের দেশের মাটিতে দেশবিরোধী নাগরিকের মাথায় বোমা ফেলতেও হয়েছে।

সংবিধানের Preamble এ Nation শব্দটাকে একেবারে শেষ লাইনের একটা কোণে স্থান দেওয়া হয়েছে। এটা একজন দেশপ্রেমী মানুষের কাছে কতটা অসম্মানের সেটা ভারতবাসী বুঝতে পারবে সেই দিন যেদিন মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষার কুপ্রভাবের বাইরে বেরিয়ে এসে ভারতের মাটির কাছ থেকে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করার সামর্থ তারা অর্জন করে উঠতে পারবে। সোজা কথায় ক্লাস এইটের সরলতা নিয়ে বলতে পারি একটা লাইন সংবিধানের preamble-এ আমরা মিস করি সেটা হল We are one nation। আমি ভারতের সংবিধানের Preamble অংশটি পাঠকের সামনে তুলে ধরছি-

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political:

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the Individual and the unity and Integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

এবারে আসি preamble-এর JUSTICE শব্দটার বিষয়ে যার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই Article 124A তে যেখানে National Judiciary Appointment Committee র কথা বলা হয়েছে যার লক্ষ্যটা ছিল preamble এ বর্ণিত JUSTICE বিষয়টাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। পৃথিবীর প্রায় সব কটা দেশের সংবিধান পড়ার পড়ে মনে হয়েছে সাংবিধানিক পণ্ডিতরা যাই বলুক আধুনিক সংবিধানকে শুধু একটা রাষ্ট্রের গঠনাত্মক নীতিমালা হয়ে উঠলে হবে না একই সঙ্গে তাকে দেশের অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে দেশের মাটির সেন্টিমেন্টের সিমেন্ট দিয়ে জুড়তে হবে যার কঠিন কাঠামোর উপর দেশের ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। চিনের সংবিধানের preamble এ motherland শব্দটা দেখে চমকে গিয়েছিলাম, মনে হয়েছিল এই বিশেষ শব্দটা তো আমাদের সংবিধানে থাকার কথা ছিল, মনে প্রশ্ন জাগে কোন সেই শক্তি যা আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের কলম সংযত করতে বাধ্য করেছিল।

জাতীয়তাবাদী ইমিউনিটি যেহেতু সংবিধানে বিধিবদ্ধ ছিল না তাই শাসনতান্ত্রিক দুর্বল পরিবেশে সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলোকে চেটে পুটে

আস্বাদন করার লক্ষ্যে অন্যান্য দর্শন ধারীদের সঙ্গে মার্কসবাদীরা ভারতের মাটিতে তাদের রক্তক্ষয়ী দর্শনকে অভ্যাস করার সার্টিফিকেট পেয়ে গেল। কমিউনিস্ট দর্শনটার মূল কথা হলো সশস্ত্র বিপ্লব "ruling classes tremble at the Communistic revolution", রাষ্ট্র বিরোধিতা এবং হিংসা যে দর্শনের মূল কথা সেই দর্শন আশ্রিত একটা দল কী করে ভারতের মাটিতে মার্ক্সবাদী দল নাম নিয়ে ভোটে দাঁড়াবার অধিকার পায় এটা কিন্তু যারা নিজেদের দেশপ্রেমী এবং সংবিধান বিশারদ বলে চিহ্নিত করেন তাদের ভেবে দেখা উচিত। রাষ্ট্রবিরোধী দর্শনপুষ্ট কোন রাজনৈতিক দলকে ভোটে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রদান অবশ্যই একটা সংবিধান বিরোধী কাজ।

১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর মনুস্মৃতি পোড়ানো হয়েছিল এবং সেই দিনটিকে 'মনুস্মৃতি দহন দিবস' হিসেবে চিহ্নিত এবং পালিত হয়। সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকর ছিলেন এই ঘটনার নীরব সাক্ষী, তিনি কী কখনো ভাবতে সাহস করেছিলেন যে মনুস্মৃতির পাশাপশি রাষ্ট্রবিরোধী কমিউনিস্ট দর্শনের বইগুলোকেও পোড়ানো উচিত! আম্বেদকর সম্ভবত মানুষের প্রতি অত্যাচার বলতে তার ধারণাকে তিনি শুধু মনুস্মৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন তার লেখায় কোথাও রাষ্ট্রবিরোধী দর্শনগুলোর বিষয়ে তার মতামত প্রতিফলিত হয় নি।

সংবিধান জাতীয়তাবাদী কণ্ঠকে স্বীকার না করায় দেশের মাটিতে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো সংঘটিত হতে পারে না এবং রাষ্ট্রবিরোধতার প্রশ্নে মানুষের প্রতিবাদে ভোট ভিখারি রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন পায় না। নেতাজিকে কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত করার একটা প্রবণতা কিছু কিছু বামপন্থী পণ্ডিতদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি কিন্তু ভাবি তারা কী কখনও নেতাজির "জয় হিন্দ" ধ্বনিটা শোনেননি। মানুষকে এটা বোঝানো কঠিন যে সংবিধানের PREAMBLE এর "WE THE PEOPLE OF INDIA" ঘোষণার বিপ্রতীপে নেতাজির "জয় হিন্দ" ধ্বনি যে শুধু হিন্দুস্তানের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জয়োল্লাস নয় বরং একটা প্রাচীন সভ্য রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিজয়কেও একই সাথে ঘোষণা করে।

নেতাজির মর্মগুরু স্বামীজী আমেরিকায় গিয়ে ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রভুদের উদ্দ্যেশে স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে ভারতের সম্পদ চুরি করে ধনাঢ্য ওই প্রভুদের পূর্বপুরুষদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে যখন তারা তাদের পাইরেট পূর্বপুরুষদের কথা স্মরণ করবেন তখন দমনে শোষণে ভিখারি বনে যাওয়া ভারতের মাটিতে একজন ভিখারী তার পরিচয় দিতে গিয়ে কোন না কোন মুনি ঋষির নাম উচ্চারণ করবেন, এটাই সঠিক ভারতবর্ষ। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলো যখন ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে ভারতবর্ষের জাতীয় সত্তাকে অস্বীকার করার কূটকৌশল অবলম্বন করে চলেছে তখন ভারতের মাটির স্পর্শধন্য ওই দরিদ্র মানুষগুলো তাদের প্রাত্যহিক দীনতম জীবনযাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের হৃদয়ে তাদের ভারতবর্ষকে অমলিন রাখার নিরন্তর সাধনা করে চলেছেন, ওদের পাতার কুটিরে ভারত সভ্যতার সেঁজুতির দীপ্তি আজও অম্লান।

১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর মনুস্মৃতি পোড়ানো হয়েছিল এবং সেই দিনটিকে 'মনুস্মৃতি দহন দিবস' হিসেবে চিহ্নিত এবং পালিত হয়। সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকর ছিলেন এই ঘটনার নীরব সাক্ষী, তিনি কী কখনো ভাবতে সাহস করেছিলেন যে মনুস্মৃতির পাশাপশি রাষ্ট্রবিরোধী কমিউনিস্ট দর্শনের বইগুলোকেও পোড়ানো উচিত! আম্বেদকর সম্ভবত মানুষের প্রতি অত্যাচার বলতে তার ধারণাকে তিনি শুধু মনুস্মৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন তার লেখায় কোথাও রাষ্ট্রবিরোধী দর্শনগুলোর বিষয়ে তার মতামত প্রতিফলিত হয়নি।

ফেক নিউজ

ইস্যু আদানি:ফেক নিউজের টার্গেট বিজেপি

সম্প্রতি আমেরিকার একটি আদালতে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে মামলা হয়েছে আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দুবছরের পুরানো এবং ঘটনাস্থল অ্যামেরিকা নয়। অভিযোগ, ঘুষ দেওয়া হয়েছে ভারতের বিভিন্ন নেতা মন্ত্রী অফিসারকে। অভিযোগ সত্য নাকি মিথ্যা সেটা আদালতের বিচার্য বিষয়। তবে অতীতে বারবার দেখা গেছে যখনই বিজেপি সরকার গুরুত্বপূর্ণ কোন বিল সংসদে পাস করতে চেষ্টা করেছে তখনই নানাভাবে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করার প্রচেষ্টা করেছে কংগ্রেসের রক্ষাকর্তা জর্জ সোরস সহ অনেক বিদেশি শক্তি। জর্জ সোরস স্পন্সরড এবারের ইস্যু আদানি।

দেখুন এই হোয়াটসঅ্যাপ বার্তালাপ। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের দাবি এই কথোপকথন নরেন্দ্র মোদী এবং গৌতম আদানির মধ্যে হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না এই দাবি একশো শতাংশ মিথ্যা। ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে খুব কাঁচা হাতে এই বার্তালাপ তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নরেন্দ্র মোদীকে বদনাম করার জন্য।

আদানি নিয়ে রাহুল গান্ধীর টার্গেট এখন নরেন্দ্র মোদী সমেত গোটা বিজেপি নেতৃত্বকে। কিন্তু দিনের শেষে বাস্তব সত্য হল আদানিদের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে চারটি রাজ্যে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ২২৩৭ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তার একটিও বিজেপি শাসিত ছিল না সেই সময়। রাজ্যগুলি হল তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং ছত্তিশগড়। এ ছাড়া তৎকালীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের নামও রয়েছে। পরবর্তীতে অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং ছত্তিসগড়ে বিজেপি শাসিত সরকার ক্ষমতায় এলেও সেই সময় (২০২১- ২০২২) সেখানে বিরোধী দলের শাসন ছিল। অভিযোগপত্রে নাম না থাকলেও উল্লেখিত চার রাজ্য ছাড়া কংগ্রেসের শাসনে থাকার সময় রাজস্থানে অশোক গেহলটের সরকার ৬৫০০০ কোটি এবং কংগ্রেসের অধীনে থাকা কর্নাটকের সীতারামাইয়া সরকার এক লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ পেয়েছিল আদানি গ্রুপের থেকে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা বেসরকারিকরনের উদ্দেশ্যে রাজ্যে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিটিংও করে গেছেন গৌতম আদানি।

আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই রাজ্যসহ দেশের বিভিন্ন মিডিয়া হাউস থেকে প্রচার করা হতে থাকে যে লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাংক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এবার ডুবে যেতে বসেছে। যদিও আদানিদের দেনার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলেও তাদের সম্পদের পরিমাণ আরও বেশি যা ব্যাংকের লোন শোধ করার জন্য যথেষ্ট এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, আদানি গ্রুপের লোন স্টেট ব্যাংকের মোট লোন বুকের এক শতাংশেরও কম। একই বিষয় এলআইসি সমেত অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোরও। বিশ্ব বাজারের অন্যতম বড় সংস্থা জিপি মরগ্যানও এই কথাই মনে করিয়েছে।

দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা:বামপন্থী সাংবাদিকরা ছড়ালো ফেক নিউজ

রানা আইয়ুব কংগ্রেসের টুলকিট। বাম এবং কংগ্রেসের যে ফেক নিউজ ফ্যাক্টরি চলে তাতে রসদের যোগান দেয় রানা আইয়ুবের মত লোকজন। তাতে তাদের সাম্প্রতিকতম সংযোজন উত্তর প্রদেশের সম্বলের ঘটনার উপর নির্ভর করে ছড়ানো মিথ্যে কিছু খবর।

ঘটনার সূত্রপাত সম্বলের একটি মসজিদে করা সার্ভে নিয়ে।

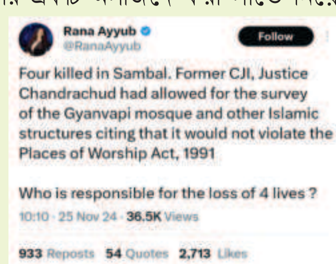

আদালতের রায় এবং তত্ত্বাবধানে সার্ভে চলছিল ওই এলাকায়। কিন্তু কিছু মৌলবাদীর উসকানিতে হঠাৎই চারপাশ থেকে পাথর ছুটতে

আরম্ভ করে কিছু সমাজবিরোধী মানুষ। এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত অন্ততপক্ষে ৪০ জন পুলিশ কর্মী তাতে আহত হয়েছেন। বেশ কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক। এই পাথরবাজিতে এবং জনতা পুলিশ খন্ডযুদ্ধের মাঝে পড়ে চারজন সাধারণ মানুষেরও প্রাণ যায়। এই মৃত্যুগুলির পিছনে কোনভাবেই উত্তরপ্রদেশ পুলিশ বা ভারতীয় বিচারব্যবস্থা দায়ী নয়। যদিও ঘটনার পর থেকেই সরাসরি পুলিশকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে তুলেছে কংগ্রেসের টুলকিট হিসেবে কাজ করা বামপন্থী এবং মৌলবাদী সাংবাদিকরা। ১০০ শতাংশ মিথ্যে খবর হিসাবে তারা প্রচার করছে পুলিশের হাতেই নাকি মারা গেছে ওই চারজন।

আবার হার, আবার টার্গেট ইভিএম

মহারাষ্ট্র ঐতিহাসিক সাফল্য পেয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। আর তারপরই শুরু হয়েছে সেই এক মরাকান্না। সেই

এক মিথ্যে অভিযোগ ইভিএম হ্যাকিংয়ের, যা বাস্তবে সম্ভব নয়।

বিষয়টা যেন এমন যে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্রিশগড়, উড়িষ্যায় ইভিএম হ্যাক করা হয়েছে কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর বা কর্নাটকে তা ঠিকঠাক চলেছে। মহারাষ্ট্রে হ্যাক করা হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা তামিলনাড়ুতে হ্যাক করা যায়নি। যদিও বাম কংগ্রেস তৃণমূলের সম্মিলিত লবি এখনো ঠিক করে উঠতে পারেনি কেরালায় ইভিএম হ্যাক হয়েছে নাকি হয়নি।

ফেক নিউজ বিদেশ থেকেও

ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় যে বিদেশের শত্রুর মদত আছে তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। আল জাজিরার মত বিখ্যাত বা কুখ্যাত মিডিয়া হাউস যখন ভারতের বিরুদ্ধে খোলাখুলি মিথ্যা খবর প্রচার করে তখন বিদেশি শক্তির হাত নিয়ে আর কোন সন্দেহ থাকা উচিত না। সম্প্রতি ভারত-সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ক যখন গভীর হচ্ছে তখন আল-জাজিরা প্রচার করে সৌদি আরব নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতে

কোনরকম রপ্তানি তারা করবে না। যদিও খবর প্রচারের কিছু সময়ের মধ্যে সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভারত - সৌদি সম্পর্কে খারাপ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আল জাজিরা এই খবর প্রচার করেছে।

ফেক নিউজ এবং মিথ্যা প্রপাগান্ডার সবথেকে বড় টার্গেট ভারতীয় রেল

কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ছবিতে দেখা যায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় এক ভদ্রমহিলা লাগেজ নিয়ে দরজার কাছে বসে আছেন এবং বলা হচ্ছে একজন মহিলাকে বসার জায়গা পর্যন্ত দিতে ভারতীয় রেল অক্ষম। অন্তত কয়েক হাজার মানুষ দাবি করেন সেই ছবি তাঁর স্ত্রীর। যদিও বাস্তব হল ভারতীয় রেলের

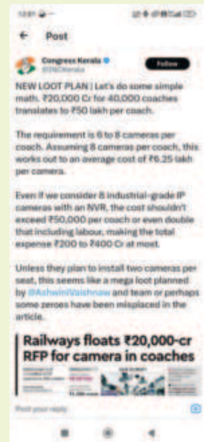

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় রিজার্ভেশন ছাড়া ওঠা যায় না। অর্থাৎ ওই মহিলা (তিনি প্রকৃত যাত্রী অথবা অভিনেত্রী যাই হোন) রেলে উঠেছেন মানে ওনার সংরক্ষণ আছে। সে ক্ষেত্রে ওনার জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট সিট বরাদ্দ আছে। সেখানে না গিয়ে গেটের কাছে লাগেজ নিয়ে এ রকমের শুটিং আসলে ফেক নিউজ ছড়ানোর জন্য করা হয়।

এখানে কংগ্রেস একটা মনগড়া সংখ্যা তৈরি করে খবর ছড়িয়ে বদনাম করছে ভারতীয় রেলকে। বলা হচ্ছে কামরায় সিসিটিভি বসানোর জন্য নাকি অস্বাভাবিক একটা অংকের টাকা বরাদ্দ করেছে ভারতীয় রেল। যদিও কংগ্রেস ভুলে গেছে সিসিটিভি কেলেঙ্কারি তাদের ইন্ডি জোটের পার্টনার তৃণমূল কংগ্রেস করলেও বিজেপি কখনো করে না। রেলমন্ত্রীর জানিয়ে দেয় ওই খবর একদম মিথ্যে এবং এরকম কোনো বরাদ্দ মন্ত্রক থেকে কোনও কালেই হয়নি।

ঝাড়খণ্ডের রাঁচি-তে নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী রোডশো-তে জনগণের উচ্ছ্বাস।

মুম্বইয়ে নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী জনসভায় জনসমুদ্র।

জনজাতীয় গৌরব দিবসে বিহারের জামুই জেলায়
জনজাতি সম্প্রদায়ের 'আদি' হাটে প্রধানমন্ত্রী।

নয়াদিল্লিতে বোড়োল্যান্ড মহোৎসবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

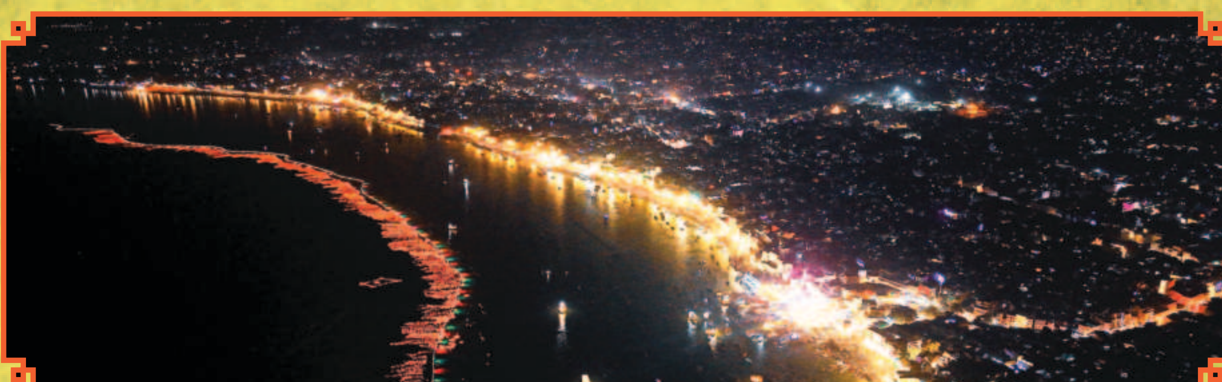

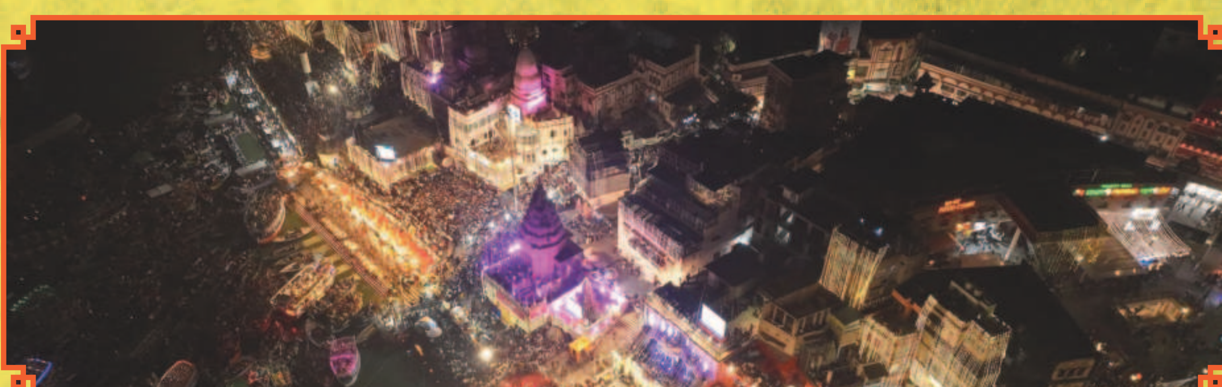

দেব দীপাবলীতে লক্ষাধিক প্রদীপে আলোকিত বাবা বিশ্বনাথের কাশী নগরী।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।